বারোয়ারি বিবি

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য

মন্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১. মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
মণ্ডল বুক হাউস
৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীগণেশ বসু

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীসুকুমার ভাণ্ডারী
রামকৃষ্ণ প্রেস
৬, শিব্ বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

গ্রন্থন
দীননাথ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৬১, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯

শ্রীশ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বক্তব্য

যে সমাজ থেকে এ উপন্যাসের মূল চরিত্রগুলি সংগৃহীত হয়েছে, তাদের কথোপকথনে তথাকথিত ভব্যতা আশা করা যায় না—ভাষা-সংযম করে সংলাপ রচনা করতে গেলে কাহিনী-রচনা হয়তো সম্পূর্ণ হ'ত, কিন্তু চরিত্র পরিস্ফুটন সম্ভব হ'ত না। চরিত্রের স্বাভাবিকতা এবং সংলাপের সভ্যতা এই দুই-এর মধ্যে প্রথমোক্তটি বেছে নিয়েছি। উপন্যাসটি ধর্মোপাখ্যান নয়, জীবনোপাখ্যান—সেই দৃষ্টিতে বিচার্য বলে মনে করি।

লেখক

লেখকের অন্য বই

ইস্ট বাকল্যাণ্ড রোড

বারোয়ারী বিবি

আবার বৃষ্টি নামল।

জমকালো সূর্যের আলো আকাশের নীল সামিয়ানায় সমান ভাবে ছড়িয়ে আছে। মেঘের লেশমাত্র নেই। অথচ—

শের-ও স্বীকার করে। অভিজ্ঞতা-গম্ভীর সুরে বলে—শরতের আকাশ তো নয়, যেন কোঠাবাড়ির বাইজী! কিম্বা বলতে পারিস, বহুরূপী গিরগিট্। কখন যে কি 'সক্ল্' ধরে বসবে তা বুঝতে হলে সাত পীরকে সত্তর বার বেহেস্ত আর দুনিয়ার আপ-ডাউন টিরেনে সফর করতে হবে। আর যত 'বুজুর' মুসাফিরকে সালাম জানিয়ে তাদের কাছে তালিম নিতে হবে। সেই সাত-সতেরো জন্মের খুঁটিনাটি, ছোটা-বড়া তজুরবা (অভিজ্ঞতা) মগজের কেঁড়েতে ভরে জিন্দগীর জি. টি. রোডে টম্‌টম্ ছোটালে যদি বুঝতে পারিস, এই শরতের সিজিনটাকে!

শের কথা বলতে ভালবাসে। লছমীর সামনে কণ্ঠের তালাচাবি খোলার সুযোগ পেলে সে আর কিছু চায় না।

—আঁখজোড়া খুলে রাখ লছমী। চোখ মেলে দেখ। কান খুলে শোন। দিল দিয়ে বুঝতে চেষ্টা কর। সাচ্ সাচ্ দেখতে শুনতে আর বুঝতে শিখলে দেখবি দুনিয়ার জাদুঘরে আজব তাজ্জব বলে কিছু নেই। সব টিরেন লাইনের মত সিধা। এ টিশনে এনজিনের হেডলাইট ফোকেস মারলে ও টিশনে মাষ্টারবাবুর টিলেগরাপের কল টর-টর করে উঠবে।

লছমী হাতের সেলাইটা ফেলে দিয়ে ধমক দেয়—থাম বাপু তুই! তোর সোজা কথার মানে বুঝতে আমার মাথা ধরে যায়।

—তা তো হবেই—লছমীর কথা শের মেনে নেয়; অবাধ বিশ্বাসের সঙ্গে মেনে নিয়ে বলে—তুই যে আওরাৎ। মে' মানুষ! সিধা পুরুষ মানুষের সিধা বাৎ-কে তোরা খাড়া পাহাড়ের মত ভয় পাস। তোরা সাঁপ বিচ্ছুর জাত কিনা! টেরহা-বাঁকা রাস্তার কোণ ঘেঁষে ছুটতে পারিস. কিন্তু সোজা পথে পড়লেই রাপ্তার (গতি) একদম জিরো!

শের বলে। অনেক কথাই সে অনর্গল বলে যায়। লছমীর চোখে চোখ রাখলে তার জুবানের (জিভ) গডরেজ তালা কোন্ অদৃশ্য জিনের ফুসমন্তরে খুলে যায়। লছমী কোনটা শোনে, অধিকাংশই শোনে না। কিন্তু অতি আগ্রহীর মত মুখভঙ্গি করে বসে থাকে।

কিন্তু শের যা'ই বলুক, লছমী পীরাঈন বা পয়গম্বরা নয়। দুনিয়া আর বেহেস্তের আপ ডাউন টিরেনে তার কতবার গতায়াত হয়েছে, তা সে জানে না। শেরের ভাষায়, লছমী শরতের আকাশের মত রহস্যময় কোঠাবাড়ির বাইজীও নয়। পোকা খাওয়া দেহের কালো চামড়ায় রেশমী ওড়নার আস্তরণ টেনে সে জীবনের ভদ্রাসন সাজায়নি।

চিন্তা করতে বসলে নিজেকে অসহায় মনে হয়। দেহ পণ্যের ব্যবসায় জীবিকা অর্জনের কথাটুকু লছমী বুঝতে পারে; কিন্তু পসারিণী ভেদে সেই একই পণ্যের ব্যবসায় যে কারো-কারো যৌতুকেরও সংমিশ্রণ হয়, এবং কেন হয়, এ রহস্য সে আজও ধরতে পারেনি।

লছমীর ক্ষোভ জাগে। কণ্ঠে সুর নেই। চোখের দৃষ্টিতে উঁচুতলার আভিজাত্যের প্রলেপ নেই। সারেঙ্গীর কাঁদুনে সুর ছাপিয়ে তার

কাল্পনিক বিরহ বর্ষারাতের কাঁদুনে আকাশের গায়ে অশ্রুর প্রলেপ মাখায় না।

—দোকান সাজাতে না শিখলে সওদা কি বিক্রি হয়রে পাগলী!

শের তামাসা করে অহরহ। অন্তরঙ্গ সুরে সহানুভূতিও জানায়। তখন তার কৌতুকের ভুবড়ি-ছোটানো কণ্ঠস্বর সমবেদনায় ভিজে ওঠে। মুখে বিশেষ শব্দ ফুটতে চায় না।

তবু শের বলে—লছমী, তোর যা সওদা সেই সওদা ঐ বাইজীরাও বেচে। কিন্তু তুই 'প্রাফিট্' তুলতে পারিস না!

প্রফিট্ শব্দের মানে লছমী জানে। এমন দু'চারটে আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহারও সে করে। কিন্তু 'প্রাফিটে'র তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারে না। ঘর ভাড়া, পেটের ভাত, মাঝে মাঝে এক আধটা রেশমী শাড়ি কখনো বা একজোড়া চাঁদির কানফুল তার পারিশ্রমিকের ওপর পুরস্কার স্বরূপ জুটে যায়। পুরনো গ্রাহকরা পাল-পার্বনে বকশিশও দিয়ে যায়। তোরঙ্গের তলা খুঁজলে অনাকাঙ্ক্ষিত অথচ অবশ্যম্ভাবী দিনের জন্য সঞ্চিত, দশ টাকার অঙ্কে বাঁধা খানকয়েক নোটও মিলবে। সরকারী ব্যাঙ্কের পোদ্দারকে খোসামোদ করে বদলে নেওয়া আনকোরা নতুন নোট। জীবনের সাধারণ দাবি আর ছোট-খাট দু'একটা শখ-নেশা মিটিয়েও খানিকটা উপরি সংস্থান। এই-ই তো 'প্রাফিট্'!

ও পাশের বালতি কারখানা থেকে টিন পেটানোর শব্দ এতদূর ভেসে আসে। কিন্তু তাতে শেরের কথাবার্তায় ব্যাঘাত হয় না—ন' সমঝ পাগলী—অবুঝ পাগলী কোথাকার—শের হাসে, কিন্তু প্রাফিট্ শব্দের ব্যাখ্যা সেও করতে পারে না। বুদ্ধির ব্যাঙ্কটাকে দেউলিয়া মনে হয়। দিক হাতড়েও একটা উপযুক্ত কথা খুঁজে

পায় না। অথচ সে অনুভব করে, একটা অর্থ আছে। প্রাফিটের সংজ্ঞা সে অবশ্যই জানে। তার ভাষায় প্রাচুর্যের ঘাটতি পড়েনি কোনদিন। কিন্তু সে যা বলতে চায় তা পারে না। শেষে বিরক্তি দেখিয়ে বলে—প্রাফিট্ বুঝিস না—মুনাফা! তবে এ কারবারে নেমেছিস কেন, ঘরের বিবি সেজে বসে থাকগে যা? আর নয় তো জাহন্নমে যা।

—কি প্রাফিট্ প্রাফিট্ বকছিস! লছমী শেরের স্কন্ধস্থিত রঙীন তোয়ালেটা টেনে নিয়ে অযথা একবার নিজের মুখ মুছে নেয়। তারপর নিজস্ব ব্যবসাবুদ্ধির অস্তিত্বকে শেরের শ্লেষ আর দৃঢ় প্রতিবাদের পাথরে ঠুকে বাজিয়ে দেখিয়ে দেয়—খেয়ে পরে দু'হাতে খরচ করেও আমার কত টাকা জমেছে জানিস!

—জানি।

—বল তো কত?

—কত আবার! মশানে পোড়বার মত লকড়ির খরচ?

—তা বইকি! লছমী গরে-গরে ভাষায় শুনিয়ে দেয়—আমার লকড়ি খরচ করে যা বাঁচবে তাতে তোর কবরের খরচও কুলিয়ে যাবে।……দু'শ টাকা কোনদিন একসঙ্গে দেখেছিস?

—কত বললি, দু'শ? শের হেসে ওঠে, একবার চকিতে ঘরের চৌকাঠের ওপারে দেখে নেয়, তারপর উদাত্ত স্বরের গায়ে মৃদু-ভাষের ঝলমল কোর্তা জড়িয়ে বলে—সে'বার মির্জান হাটে সাউদের গোলার ক্যাশ লুটের দরুন আমার হিস্সা কত পড়েছিল জানিস—তেইশ শ' টাকা। টোয়েনটিত্রি থাউজেন—না না টোয়েনটিত্রি হানরেড।

—কি করলি সে টাকা?

—কি আবার—শের পরম তাচ্ছল্যের সঙ্গে ঠোঁট উল্টে জবাব দেয়—আমি কি বেনিয়ার পোষা ছারপোকা যে বাচ্চা পায়দা করাবার জন্যে টাকার বাণ্ডিল আইরান সেফ-এ লক্‌আপ করে রাখব? যাবা বিলায়তী পানি খায় তারা টোয়েনটিত্রি হানরেডকে টাকা বলে গিনতি করে না। শ্যামপানির বোতলের ছিপি খুললে অমন কত হানবেড সাবুনের ফেনার মতন ভ্যানিস হয়ে যায়।

শরতের আকাশটাকে লছমী বুঝে উঠতে পারে না। এইমাত্র গনগনে সূর্যের মাত্রাদেওয়া আকাশ-জোড়া রোদ দেখে মাতালের বমি মাখানো চটচটে বিছানার মত সেঁতসেঁতে দুর্গন্ধময় বিছানাটা ঘরের সামনে উঠনে পাতা দড়ির খাটিয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে সে উনুনে আঁচ দিতে বসেছে, আর বলা-কওয়া নেই, মেঘের গর্জন নেই, বিদ্যুতের তর্জন নেই, কোথা থেকে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল! বিছানাটা ফেঁপে-ফুলে চুপসে মুচড়ে এক-সা হয়ে গেল। সাধে কি শের শরতেব আকাশটাকে তিনমহলা কোঠাবাড়ির পম্‌টম্‌লালী-মাখা বাইজী নাম দিয়েছে! দুটোই দুর্বোধ্যতায় ভরপুর। সাংঘাতিক বিশ্বাসঘাতক। হতচ্ছাড়া গুণ্ডাটা অনর্গল বক্‌বক করে বটে, কিন্তু কথা বলে একেবারে সাচ্চা। তার কথা যুক্তির জাঁতিতে কাটে না, প্রতিবাদের হাতুড়িতে ভাঙে না। যেন পাকামসলা গাঁথা ঠাসগাঁথুনির ইমারৎ।

কোঠাবাড়ির বাইজীগুলো—ওরাও যে এমনি! হাসতে হাসতে গাইতে গাইতে কখন যে চোখের সুর্মাকাজল আর গালের লালী-অশ্রুবন্যায় একাকার করে ফেলবে তার স্থিরতা নেই।

—বাইজীর আঁখ তো নয়—বলতে গিয়ে শের শিউরে ওঠে!

—আঁখ নয়তো কি!

—মানুষের আঁখ আর মুখ একই জিনিস। দুটোই কথা বলে। মুখ চেঁচিয়ে বলে, আঁখ বলে চুপিচুপি। 'আঁখের যদি ভাষা না থাকত তাহলে দুনিয়ায় পহলী মুহব্বত বলে কোনদিন কিছু হত না। আঁখ দেখে আমি তোর দিলকী বাৎ বুঝতে পারি। কিন্তু বাইজীর আঁখের জিভ নেই। ও ভাষা বুঝতে গেলে ইনশান মরুভূমির মরীচিকায় হারিয়ে যায়। তার জিন্দগী বরবাদ হয়ে যায়। শুনে লছমী ভাবে, মরণ হয় না এই বাইজীগুলোর। এদের সর্বত্রই গরমিল। জন্মকর্ম হাসিকান্না কোথাও কোন সামঞ্জস্য নেই। সন্ধ্যায় এলেন খানবাহাদুর, যেমন নিয়মিত আসেন; তারপর আবার হঠাৎ কোন মাঝরাতে ভজন শুনতে এলেন কাশীপ্রবাসী বৃদ্ধ রায়বাহাদুর। তার প্রায় বছর খানেক পরে হয়তো শোনা গেল, বাইজীর সদ্যজাত মেয়েটার মুখ হয়েছে ঠিক রায়বাহাদুরের মত! চোখ নাক—এমন কি থুতনীর নিচে তিলটা পর্যন্ত রায়-বাহাদুরের এক আকস্মিক নৈশ অভিযানের সাক্ষরের মত নব-জাতিকার সর্বাঙ্গ আঁকড়ে আছে। কাশীবাসী রায়বাহাদুরের কাছে সুসংবাদ নিয়ে লোক ছোটে। সুখবর নিবেদন করে। তিনি তুলসীর মালাটি ললাটে ঠেকিয়ে ঝুলির ভেতর পুরে ফেলেন। তারপর নীরব নতমুখে চেক কেটে দেন। অথচ, বিচিত্র এই, ভাগ্যবতী নটীকে কেউ কোনদিন অন্তঃসত্ত্বা হতে দেখেনি। দেখেনি তার দেহে আসন্ন মাতৃত্বের কোন চিহ্ন। এদের সবটাই শরতের জলবিদ্যুৎহীন আকাশের মত পূর্বপ্রস্তুতি-বিহীন আকস্মিক ঘনঘটায় পূর্ণ।

এ সব বিচিত্রোপন্যাস লছমী কানেই শোনে শুধু। শুনতে শুনতে

স্তম্ভিত বিস্ময় নিয়ে শেরের দিকে তাকিয়ে থাকে। নাক সিঁটকে ভ্রূ কুঞ্চিত করে সারামুখে অপ্রত্যয়ের চিহ্ন ফুটিয়ে বলে—যাঃ, তুই বড় মিছে কথা বলিস, শের!

—আল্লাহ্ কসম্—শের লছমীর গা ছুঁয়ে বলে, তোর কিরিয়া, একটা কথাও ঝুট বলছি না! ঝুট আমার হারাম। মর্দানা কখনো ঝুট বলেনা, ঝুট বলে কায়র (ভীরু)।

লছমী আর অবিশ্বাস কয়তে পারে না, তবু মাঝে দু'একটা মন্তব্য করে ফেলে। আর ওপরতলার বাইজীদের জীবন-আলেখ্যে জীবন সংবিধান অনুসন্ধানের পণ্ডশ্রম করে।

—মরণ! কয়লার ধুলোমাখা হাত নিয়ে লছমী ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

রান্নাঘর বলে কোন আলাদা ঘর নেই। বৈঠকখানার সার্বজনীনতা থেকে গোসলখানার গোপনীয়তা সব এই খাপরা-ছাওয়া হাত কয়েকের খুপরিটাতে সম্পন্ন করতে হয়।

অসহ্য দুর্জ্ঞেয়-চরিত্র ওপরতলায় বাইজীদের মত দুর্বোধ্যচরিত শরতের আকাশের প্রতি একটা শ্লেষোক্তি করে লছমী খাটিয়াটার সামনে এসে দাঁড়াল।

—ওঠ, ওঠ ভাগাড়ের কুকুর! বিছানাকে গালাগালি দেয় লছমী! বহু অত্যাচারে জর্জরিত বালিশের শুকনো কান ধরে আকর্ষণ করে। ওদিক থেকে ভারি গলায় হাসতে হাসতে শের জবাব দেয়—দেখ, গালিগুপ্তা শুনে যদি তোর দোকানঘরটা মানুষ হয়!

শের লছমীর শয্যার নাম দিয়েছে, দোকানঘর। শুনে লছমীর কান লাল হয়, ক্রোধে গর্‌গর করে, কিন্তু কাথাটার পেছনে

সত্যের ভাগ এত বেশি যে ভাষা দিয়ে তার প্রতিবাদ করতে পারে না।

কপাল কুঁচকে লছমী তাকাল। তার সিক্ত কেশের জল শ্যামবর্ণ ললাট ভরিয়ে রেখেছিল, যেন সেই স্থির জলাশয়ে দু'একটা বিরক্তির ঢেউ জেগে উঠল।

কপালের ওপর থেকে জলের পর্দাখানা আধভিজে আঁচলে মুছে নিয়ে লছমী মার্জারী-তীক্ষ্ণ স্বরে জবাব দিলে—এই সাত-সকালে পায়ে পা জড়িয়ে ঝগড়া না বাধালে তোর চলে না, না?

শের কাছে এগিয়ে আসে। প্রমত্ত মোষের মত মাথা দুলিয়ে আসতে আসতে বিস্ময়সূচক ভঙ্গি করে বলে—হায় আলি! ঝগড়া কোথায় হ'ল? মুহব্বৎ করলে নজর এমনি উল্টিগঙ্গা দেখতে থাকে বটে! তারপর খানিকটা বিরতি দিয়ে আবার বলে—আলবাৎ—তাইতো হয়। গন্নু পসারী বলে—

—ঝাড়ু মারি তোর গন্নুর মুখে।

শেরের অসমাপ্ত কথায় প্রতিবাদের পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে লছমী সিক্তপ্রায় শয্যার স্তূপটা একসঙ্গে তোলবার চেষ্টা করে।

শেরের গতি হঠাৎ দ্রুত হল। লছমীব একান্ত সান্নিধ্যে চলে এসে সামান্য বলপ্রয়োগে তাকে খাটিয়ার ওপর নিক্ষেপ করল। তারপর সেই রক্তমাংসেব নারীদেহটিকে কাঁথা-তোষকের সঙ্গে একটি জীবন্ত মৃতদেহের মত জড়িয়ে নিয়ে স্বচ্ছন্দ ওজনের বোঝার মত কাঁধে তুলে নিলে।

লছমী ভেতর থেকে হাঁফধরা স্বরে চিৎকার করে—দম আটকে আমায় মারবি নাকি বেহেড্ গুণ্ডা!

—মর না তুই—শের তাকে বিছানাসুদ্ধ নিজের সর্বাঙ্গ দিয়ে চেপে

ধরে—গরীবের মুহব্বৎ না মরলে পুরো হয় না। মর শালী তুই। এইভাবে মরলে মশানের আগুনে পুড়ে পাক হতে হবে না, খুশ তবিয়তে বেহেস্ত চলে যাবি।

বৃষ্টিভেজা তেলচিটে বিছানার ভ্যাপসা গন্ধে লছমী হাঁফিয়ে ওঠে। মুখে কথা ফোটে না। পরিত্রাণের ব্যর্থ চেষ্টা করে সে জবাব দেয়—আমি কেন? তুই—তুই মর পাজি!

—হা-হা-হা—শেরের দেহের অন্তস্তলে যেন একগোছা কৌতুক সুড়সুড়ি দেয়—আমি আর নতুন কবে কি মরব? তু মেরী জিন্দগী-কী কাতিল (ঘাতিনী)। তোর তিরছি-নজরের চাকু মেরে আমার জিগর (হৃদয়) খান-খান করে দিয়েছিস!

ছেঁড়া-ছেঁড়া কথা আর প্রায়ছিন্ন বিছানার সঙ্গে লছমীকে একটা জীর্ণপ্রাণ মাংসপিণ্ডের মত গুটিয়ে নিয়ে শের ঘরের দিকে চলল। তারপর তাকে শয্যায় জড়ানো অবস্থায় ঘরের এককোণে নিক্ষেপ করে বললে—নে বিবি, এমনি করে মরে থাক, বেহেস্ত গিয়ে তোষক-বালিশ খুঁজতে হবে না। আমেরিকান হোটেলের মত লাজিং-বেডিং দুই-ই পেয়ে যাবি।

প্রাণান্ত চেষ্টায় শয্যার আবেষ্টন মুক্ত হয়ে লছমী উঠে দাঁড়াল। এদিক ওদিক তাকাবার বালাই তার নেই। তবু শেরের সংস্পর্শে তার আচরণে একটা সলাজ ভাব ফুটে ওঠে। পুলকের শিহরণ জাগে। শত সারমেয় লেহিত দেহের অসাড় চামড়া লজ্জার আবেশে তরঙ্গায়িত হয়। মৃতপ্রায় শরীরের শুকনো প্রাণকোষ-গুলিতে যেন নতুন রক্তকণিকা ছোট ছোট রূপলী মাছের মত খেলতে আরম্ভ করে। কেমন এক অদ্ভুত রাগ হয় লছমীর—আত্মহারা অভিমান তার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঝরে পড়ে। কেঁদে ফেলে সে!

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে লছমী বললে—তোর কি দিন রাত্তির বলে কিছু নেই শের! কেউ যদি দেখে ফেলত?

ইতস্তত দৃষ্টিক্ষেপ করে লছমী। তার সন্ত্রস্ত দৃষ্টি অনুসরণ করে শেরও একবার চতুর্দিকে তাকিয়ে নেয়। কেউ নেই কাছাকাছি। দেয়ালের টিকটিকি আর মাকড়শা, বিছানায় ছারপোকা আর পোষা নেউলটাই দেখেছে সব। এরা সব দেখেছে—কথাটা অনুভব করে শের যেন একটু লজ্জিত হ'ল।

মানুষের তুলনায় শের এদের কিঞ্চিৎ সমীহ করে। মানুষকে যতটা ঘৃণিত পরিস্থিতির নরককুণ্ডে সানন্দগর্বে অবগাহন করতে দেখেছে সে, কোন পশুপক্ষী পতঙ্গকীটকে তেমন অবস্থায় কোনদিন দেখেনি।

দেয়ালের টিকটিকিটা স্থির দৃষ্টিতে এদিকে তাকিয়ে আছে। নেউলটাও দেখেছে—তার রক্তাভ মুখ দেখে অনুমান হয়, বুঝেছে সব। সুমুখের পায়ের পাতাদুটো দিয়ে চোখ ঢাকছে যেন!

লজ্জার আঘাত খেয়ে বেহায়া শের তবু হেসে ওঠে। হাসির শেষে বলে—দেখেছে তো হয়েছে কি?

শেরের কথা লছমী ব্যঙ্গের সুরে তাকেই ফিরিয়ে দেয়—দেখেছে তো হয়েছে কি! তোর নয় চোখের পর্দা নেই—?

লছমীর সমাপ্তপ্রায় কথা শের নিজের কথার অংশস্বরূপ স্বকণ্ঠে টেনে নিয়ে কতকটা সুরেলা কণ্ঠে বলে গেল—

মেরী আঁখোমে তেরী তস্‌বীর হ্যায়,
আপনী নজরোঁকো ম্যায়নে যো দিয়া—

চোখে আমার দৃষ্টি বলতে কি কিছু আছে. সবটাই তো তোর

ছবিখানা ভরিয়ে রেখেছে? তাই নিজের দৃষ্টি আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমি বাস্তবিকই অন্ধ। প্রেমান্ধ!

কিন্তু লছমী শুনতে চায় না। শুনতে চায় না শেরের স্বরচিত ভাঙা-সুরের শায়েরী। ব্যগ্র মনোভাব নিয়ে সে জানতে চায়, দিনের বেলাকার এই অপকীর্তি কে-কে দেখেছে!

দেয়ালের টিকটিকি বা খাটিয়ার পায়ার সঙ্গে বাঁধা নেউলটার কথা শের উল্লেখ করে না। এদের দেখার মূল্য লছমী দেবে না। এদের বিদ্রূপবাণে জর্জরিত হলেও গায়ে মাখবে না সে, বরং তাচ্ছিল্যেব সঙ্গে ঠোঁট উল্টোবে একটু।

তাই শের উঠনের অপরাংশে একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে দেয়—সীতিয়া দেখেছে।

লছমীর কান ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে। মাথাটাও যেন ঘুরে উঠল। কতকটা নিজের অজ্ঞাতে তার মুখ দিয়ে একটা শব্দ বেবিয়ে এল—ছি-ছি-—

—ছি-ছি—! পরম ঘৃণায় শের জবাব দিলে—ছি ছি কেন, সীতিয়া দেখেছে তো হয়েছে কি, ওটা তো কুত্তী?

—কি বললি! শেরের মন্তব্য শরের মত লছমীর অন্তর বিঁধে গেল। কে কুত্তী, জীতিয়া, মায়া, মন্দোদরী,—ওরা কুত্তী! তবে সে নিজে কি? সে-ও তো একই গোত্রের জীব, মনুষ্যসৃষ্ট পশুবংশেই তার জন্ম!

লছমীর মনের বেদনার্ত কালোছায়া তার চোখে ফুটে উঠেছে, কিন্তু সেদিকে শেরের দৃষ্টি পড়ে না। নিজের কথা আরো জোর দিয়েই সে সমর্থন করে—বললুম কুত্তী। যে আওরাৎ দিনেরাতে চেনা অচেনা বিশটা জানোয়ারকে নিকা করে সে তো কুত্তী?

—তবে আমিও! লছমী আহত বিক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে শেরের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

লছমীর ম্লান দৃষ্টির কৃষ্ণবর্ণ পর্দায় ঢাকা পড়ে শেরের স্বচ্ছন্দ জবাব যেন এবার একটু ঝিমিয়ে আসে, তবু বলা কথা সে সম্পূর্ণ ফিরিয়ে নিতে পারে না। ফেলা থুথু আর বলা কথা সে ফিরিয়ে নিতে জানেও না।

সামান্য দ্বিধাখণ্ডিত কণ্ঠে শের বলে—তা-তা-তুইও—

—আমি কুত্তী! লছমীর চোখের সামনে থেকে বাকি আলোর রেখাটুকু নিঃশেষে মিলিয়ে গেল। অন্ধক্রোধে সে বললে—আর আমায় এ কথা বলবি? বে-সরম, বে-হুদা মরদ, তোর লজ্জা করে না, বিবিকে তুই কুত্তী বলিস?

বলতে বলতে নিজের সমস্ত দেহভার নিয়ে লছমী শেরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছিঁড়ে ফেলবে আজ তাকে। খেয়ে ফেলবে এই বে-সরম গুণ্ডাটাকে। ঝুটা সম্পর্কের গোর দেবে আজ এই মুহূর্তে। এই ঘরে।

আচম্বিত আক্রমণে শেরর লুঙ্গির বন্ধন শিথিল হয়ে ছোরাখানা ঘরের মেঝেয় পড়ে গিয়েছিল; সেটা কুড়িয়ে নিয়ে নগ্ন ফলাটা চুম্বন করে শের কলহপ্রবণ সুরে বললে—তুই আমার বিবি! তুই নয়, এ আমার বিবি। আমি রাতে তোর সঙ্গে ঘুমোই না, এই ছুরা কলিজায় নিয়ে মাঠে ময়দানে পড়ে থাকি।

—দেখি তোর পেয়ারী বিবিকে?

লছমী হঠাৎ শেরের হাত থেকে ছোরাখানা ছিনিয়ে নিলে, তারপর তার বুক লক্ষ্য করে এগিয়ে এল সে। জানে কোথায় আঘাত করতে হবে। শেরই শিখিয়ে দিয়েছে। ঠিক কোন্ স্থানে একটা

ঘা দিতে পারলে মানুষটার রাম-রহিম পেটের ভেতরই থেকে যাবে। মুখে কথা ফুটবে না। আল্লা মিয়ার কাছে ফরিয়াদ জানাবার আগেই তার নির্বাক-সত্তা তাঁর দরবারের চৌকাঠে হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

শেরের উন্মুক্ত বুকের সেই অব্যর্থ জায়গা লক্ষ্য করে লছমী ছোরা চালিয়ে দিলে—আয় তোর পেয়ারী বিবিকে কলিজায় ফুঁড়ে দি', দুজনে ঘুমো একসঙ্গে। এ ঘুম আর কোনদিন ভাঙবে না। আজ যাকে বিবি বলিস, কাল তাকে কুত্তী বলার ফুরসৎ পাবি না। আর কুত্তীর মুখ দেখতে হবে না তোকে।

লছমীর অব্যর্থ সন্ধান শের সামান্য দেহ আন্দোলনেই এড়িয়ে গেল। তার ছোরা শুদ্ধ হাতটা অনায়াসে নিজের মুঠির মধ্যে টেনে নিয়ে চকিত বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে শের বলে—দু'জন কেন, আয় তিনজনেই একসঙ্গে ঘুমোই? এক মিঞার চার বিবি কোরাণ শরিফেও বলে। কোরাণ শরিফে বলে। কোরাণ শরিফে অনেক কিছু বলে। শেরও সহজভাবে বলে কথাটা, কিন্তু মনের মধ্যে যেন সমর্থন পেল না। রক্ত মাংসের দেহসন্নিধ্যই যদি মিয়া-বিবির সম্পর্ক হয় তবে এমন বিবি এই মহল্লাতেই শের চারটে কেন শ'চারেক পেতে পারে। সামান্য ইঙ্গিতে তারা শেরের কামমূর্তির সামনে আত্মদানের আসন পেতে দেবে। অযাচিত আপ্যায়ন দেবে। বিনা টিকিটে গানের মুজরা, আর বিনা পয়সায় সর্বস্ব উপভোগে তার কোন অন্তরায় নেই। কিন্তু তোবা-তোবা, এ ধরনের শয্যাসুখের কল্পনা শেরের মাথায় ঢোকেনি কোনদিন। মাতালের বিছানার মত শত উপদ্রবের পঙ্কিলতা-মাখা খাটিয়ায় অঙ্গস্থাপনের চিন্তাতেই তার সারা দেহ ঘুলিয়ে ওঠে। মুমূর্ষুর মত মনে হয় নিজেকে—যেন কোন হুঁশ

নেই তার। দাঙ্গা-দঙ্গলে আহত তার অচেতন দেহকে যেন ডোম-চামারে তুলে নিয়ে কোন হাসপাতালের মড়ার বিছানায় নিক্ষেপ করেছে।

শের তখনো লছমীর হাত নিজের শক্ত মুঠিতে ধরে আছে। ধূপের ধোঁয়ার মত স্নিগ্ধ পোড়াগন্ধের স্পর্শ আছে এই হাতখানায়। শেরের সামান্য স্পর্শ-পেষণে লছমী উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তারপর সেই মানুষিক সুখের উত্তাপে সে ধীরে ধীরে পুড়তে থাকে। লছমীর সুখময় দহন শের তার তাপঘন নিশ্বাসে টের পায়। একটা জ্বালাহীন উত্তাপ, এক নিশ্চিন্ত মরণের আবেশ, লছমীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। তার স্নায়ু শিথিল হয়ে যায়।

লছমী ঘরের বাইরে দৃষ্টিপাত করে। ভয় সীতিয়াকে। অসংখ্য পুরুষ-সান্নিধ্য মেয়েটাকে যেন কলের পুতুলে পরিণত করেছে। মানুষকে আর মানুষ মনে করে না। বলে—পাইপ, নল ডোল পিপে! মানুষের সম্বন্ধে প্রাণহীন জড়পদার্থের উপমা দিতে ভালবাসে সীতিয়া।

সীতিয়া তাই ঠাট্টা করে লছমীকে—দেখছি এত খেয়েও তোর আশা মেটে না! ঐ ডবলপিপে তোকে কি দেয় বল তো?

—কি আবার দেবে? কিছু না—

—সত্যিই তো কিছু না! না পয়সা, না খাবার। বলতে বলতে সীতিয়া নীরব হয়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে—কি দেয়? নামটা ভুলে যাচ্ছি যে, ঐ যে মেয়ে পুরুষের মধ্যে হয়—সিনেমায় দেখায়? প্রেম—!

সীতিয়ার বাঁকা হাসি লছমীর ঠোঁটে যেন কাঁটার মত বিঁধে যায়, সে টেপামুখে জবাব দেয়—হ্যাঁ, প্রেম—

—প্রেম! সীতিয়ার শ্লেষজীর্ণ হাসি ভাঙা কাঁচের মত লছমীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সীতিয়া আবার বলে—নর্দমার পাঁক গড়িয়ে পচা ডোবায় পড়ে, কালোর ওপরে কালো! এর নাম প্রেম?

—জানি না—লছমী সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়।

মিথ্যে বলেনি লছমী। সত্যিই সে জানে না। শুধু ভাল লাগে শেরকে। ব্যথাও দেয় সে। শের কাছে এলে তার দেহমন সজীব বিদ্যুতের মত কাঁপতে থাকে। একটা সংশয়—সন্নিধ্যের লোভ না পাশ কটিয়ে যাওয়ার বাসনা, তা সে বুঝতে পারে না। সংশয়ের তরঙ্গকে সে ভালবাসার আলোড়ন বলে ভুল করে। কাছাকাছি জগতের অভিজ্ঞতা নিয়ে এর বেশি বোঝা যায় না।

শেরকে কতদিন আনমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে লছমী তার ধ্যানভঙ্গ করে বিরক্তিভরা সুরে বলেছে—অমন হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখিস বলতো. মাটির দিকে তাকা। চব্বিশ ঘণ্টা এত উঁচু নজর ভাল নয়!

শের চোখ নামিয়ে উত্তর দিয়েছে—জানি না আকাশে কি আছে। মাটি কুপিয়ে শুধু মাটিই বের হয়, এক-আধটা হীরের টুকরোও বেরুতে পারে, কিন্তু তার কি দাম? আশমানের দিকে স্থধু তাকিয়ে থেকে যে জিনিস পাওয়া যায়, তার দাম অনেক! তা এই পচা মাটির লছমীর চেয়ে অনেক কিম্‌তী।

লছমীর বাস্তবিকই কৌতূহল হয়—সেটা কি রে?

—মুহব্বৎ! শের গম্ভীর গলায় বলেছে—আসলি মুহব্বৎ কি মাটিতে পয়দা হয়, ওটা আশমান থেকে আসে—কুদরতী ফল। খুদাতাল্লার খাস বাগিচার আরেঞ্জ ফ্রুট। এ ফ্রুট্ না খেলে আমি কি তোকে পেয়ার করতে পারতুম? তোর ঐ কুত্তা—চাটা বাড়িটার

ত্যেলু কি, ওঠাতো একদিন মন্থুসপ্যালটির ময়লা ফেলা ডিরামে চলে যাবে!

লছমী হাত ছাড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করে—আঃ, ছাড়—

—না।

—ছাড়।

—উঁহু—শের তাকে কাছে টেনে নিতে চায়, সেজন্য সামান্য বিক্রমও সে প্রকাশ করে ফেলে।

শ্চেতচিক্কণতায় সাজানো লছমীর দাঁতের পাঁতিদুটি একটা ক্ষুধার্ত বাসনার মত অভিব্যক্ত হয়—ছাড় বলছি, হাত ছেড়ে দে; নয়তো কামড়ে খেয়ে ফেলব।

তবু শের নিষ্কৃতি দেয় না। এক অভিনব প্রক্রিয়ায় লছমীর হাতে একটু চাপ দিতে ছোরাখানা পুরুষস্পর্শকাতর তন্বীর মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, কিন্তু লছমী হাত ছাড়াতে পারে না। বরং নোঙর বাঁধা নৌকোর মত শেরের প্রশস্ত বুকের উপকূলে ধারে ধারে এগিয়ে আসে।

শেরের ভেতরটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘন তাপের নিশ্বাস পড়ে সেই সঙ্গে। মুখে ক্লান্ত বিচিত্র হাসি রেখায়িত হয়।

পরিস্থিতির আসন্ন ব্যাপকতা অনুমান করে লছমী শেরের হাতের কব্জিতে দু'পাটি দাঁত পরিপূর্ণ বিক্রমে বসিয়ে দেয়।

—আঃ ছাড়, হারামজাদী বিল্লী ছাড়!

লছমী শেরের ক্ষতস্থান থেকে মুখ তুলে নিলে। কালশিরার একটা গ্রহবলয় তার আহত কব্জিতে উল্কির মত ফুটে উঠেছে। রক্তাভ উল্কা-কণিকা ঝরছে কয়েকটা থেকে।

চিন্‌চিনে আঘাতটার দিকে তাকিয়ে শের মৃদু হাসে। তখন তার মুখখানা ধুলোয় আছাড়-খাওয়া অপ্রতিভ শিশুর মত মনে হয়। কব্জির ঘায়ে চোখ রেখে শের বলে—এঃ, রক্ত বেরিয়ে গেছে! তুই খুন পিয়েছিস বিল্লী?

নিরীহ দৃষ্টিতে ঘা-টা দেখবার জন্য লছমী শেরের হাতখানা নিজের হাতে টেনে নিয়েছিল। তার ওপর মুখ ঘষছে সে। স্নেহকাতর মার্জারীর মত তার মুখ থেকে এক রকম শব্দ বেরুচ্ছে।

শের আবার ডাকে—বিল্লী! মেরী বিলাঈয়া রাণী?

—উঁ—

—আমার খুন কেমনরে বিল্লী, ঠেস্ পেলি?

—হুঁ—লছমী মুদিত চোখে আবার সেই রক্তকণিকা ভরা কালশিরায় মুখ ঘষে—মিষ্টি, খুব মিষ্টি!

অবসাদে আবেশে লছমীর কণ্ঠ বিলুপ্ত। যেন তন্দ্রার ওড়নায় তাকে কেউ ঢেকে রেখেছে। লছমী নিজেও অনুভব করে, ঘুম আসছে তার। শের তাকে মাঝে মাঝে আশমান ভরা হুরী-পরীর গল্প শোনায়। হুরী-পরী তন্দ্রাহীন রাতে বাদশাজাদার চোখে স্বপ্নের তুলি বুলিয়ে দিয়ে যায়। যাবার সময় তন্দ্রায় ওড়নায় বাদশাজাদার দেহ ঢেকে দিয়ে চুপিচুপি পালিয়ে যায়। বাদশাজাদার ঘুম আর ভাঙে না। বুড়ো হেকিমের পাকা নূর নাড়াই সার হয়—বাদশাজাদাকে জাগাতে পারে না। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে দূত ছোটে। পীর-পয়গম্বরের অনুসন্ধান হয়। কে ভাঙাবে বাদশাজাদার ঘুম! পারিশ্রমিক অর্ধেক রাজত্ব আর শাহজাদীর মণিবন্ধ। তার জীবনভূমির চিরস্বত্ব মালিকানা।…এমনি কোন ঘুমের ওড়নায় লছমী যদি শেরকে ঢেকে রাখতে পারত!

কোথায় কোন্ দূর আকাশবর্তে লছমী যেন হারিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে হঠাৎ ফিরে এসে বলে—তুই আমায় খুব ভয় করিস, না ?

—তোকে ? শের খানিকটা বিস্ময়মাখা স্বরে প্রশ্ন করে—তোকে আমি ভয় করি !

শেরের বিস্ময় লছমী তার স্পষ্ট কথায় সরল করে দেয়—যদি ছুরিটা তোর বুকে বসিয়ে দিতুম ?

এবার শের হাসে। হাসে লছমীর কথা শুনে। তারপর—আবার অন্য কি ভেবে হেসে নেয় খানিকটা। তার ছোরাখানা অনেক বাবু-ভাইয়া আর বড়ে মিঞাকে ইলম্ দেখিয়েছে। শ্মশানের আগুন আর কবরের অন্ধকার কন্দরের সঙ্গে কতজনের অবিচ্ছেদ্য পরিণয় ঘটিয়ে দিয়েছে। এই একটুকরো লৌহফলকের প্রসাদগুণে সে জোগসর মহল্লার শের। শের-ঈ-জোগসর। ফাঁড়ির সিপাহী থেকে আরম্ভ করে অনেক হাকিম ম্যাজিস্টর তার সুপরিচিত। আগেকার দিনে কত আংরেজ সেশনস্ জজ তার মোকর্দমার রায় লিখতে কলম ভেঙে ফেলেছে। তার রেহাই-র বিরুদ্ধে আপীল করে সরকার বাহাদুর হিম্‌সিম্ খেয়ে মরেছে। অনেক একশ' সাত সতেরোর ফৌজদারী দণ্ডবিধির দফা সে ঘেঁটে এসেছে। মুচলেকা দিয়েছে বার কয়েক। মুচলেকার মেয়াদকালেই স্বাদ বদলের জন্য খুনের তিনশ' তুই ধারা চেখে এসেছে।···শোভন্ আল্লাহ ! সে সব কথা মনে পড়লে মাঝে মাঝে জীবনে বৈরাগ্য আসে, কিন্তু এই প্রিয় আয়ুধটির কথা স্মরণ হতে তা তখুনি দূর হয়ে যায়। শের অভয় দিলে মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, তার ভ্রূকুটির ফুৎকারে জিন্দগীর চেরাগ নিভে যায়।

কিন্তু লছমীর হাতে ছোরাখানা দেখলে স্বস্তি পায় না শের। আর লছমীরও এই বস্তুটার প্রতি এক উৎকট আগ্রহ আছে। খানিকটা বিরাগও আছে যেন! ছোরাখানা যেন তার সতীন। নানা অছিলায় এটাকে সে করায়ত্ত করতে চায়। কেড়ে নিতে চেষ্টা করে। শের কখনো তার হাতে চুমু খেয়ে, কখনো বা ধমক দিয়ে, ভয় দেখিয়ে অস্ত্রটা লছমীর কবল থেকে মুক্ত করে। ফুসলে টেনে নেয়, কিম্বা জোর করে ছিনিয়ে নেয়।

শের আবার হাসল। দিগন্তবিস্তৃত দরাজ বুকে করাঘাত করে বললে—যদি ছোরাটা এখানে বসিয়ে দিতিস? দিলে কি আর হ'ত! আমার শরীরের ভৈষা-চামড়া ফুঁড়ে কলজে তক্ তোর হাতের মার পৌঁছুতো না।

—না, পৌঁছুতো না! মরে তুই ভূত হয়ে যেতিস—

আজ যেন লছমী তার সামনে একটা হাসির ফোয়ারা খুলে দিয়েছে, কথায় কথায় হাসাচ্ছে শেরকে! এক অবিচ্ছিন্ন প্রকম্পের শেকড় তার মুখের ভূমণ্ডলে ছড়িয়ে গেছে।

শের তবু নিজের হাসির উৎসমুখে গাম্ভীর্যের পাথর চাপিয়ে বলে—মৌৎ কোন চিঁড়িয়ার নামরে পাগলী? আমার কাছে সরাবখানা জেলখানা আর সরকারী কসাইখানা সব বরাবর। যদি সত্যি কোনদিন আমার গলায় ফাঁসির দড়ি পড়ে তখন দেখবি, ঐ দড়ি ধরে আমি তোর কিশুন ভগবানের মত ঝুলন করব।

তারপর একটু দম নিয়ে আবার বলে—তুই আমার লছমী, তুই শুধু একবার বলবি, শের গিরগিট নয়, ইনশান। শের মর্দনার পোশাক পরা জেনানা নয়, আসলি মর্দ। সেই প্রসঙ্গের জের টেনে চলে

সে—মৌৎ ফৌৎকে দরিয়ায় ফেলে তবে লাইন ধরেছি—অনেক দিন হয়ে গেল, আর মনেও পড়ে না!

লছমী চোখজোড়া আয়ত করে বিশ্বস্ত অবিশ্বাসের সঙ্গে বলে—তুই বাঁচতে চাস না, গুণ্ডো!

—হাঁ, বাঁচতেই তো চাই, কিন্তু ইনশানের মতন। যে ইনশান মরতে ভয় পায় সে কি মানুষ, সে গিরগিট্!

ত্রস্ত দৃষ্টিতে শেরের দিকে তাকিয়ে লছমী বলে—কোনদিন তুই মরবি!

—তোর আবার নিকা হবে।

—উল্লুক গুণ্ডা!

—হা-হা-হা

—ডাকু!

—কেয়াবৎ!

—শয়তান!

—উঁহু-ইনশান।

—বদমাস, চোর—

—খবরদার হারামজাদী! জিভ ছিঁড়ে নেব—

—তুই চোর নয়তো কি? লছমী জোর দিয়ে পূর্বোক্তি সমর্থন করে—চোর, চোর, চোর! অন্ধকার রাত্তিরে মানুষের টাকা আর প্রাণ চুরি করিস, চোর ছাড়া তুই কি?

মৃত্যুস্পর্শিত আঘাতে ক্ষতবিক্ষত শেরের মুখের চামড়ায় আরো শ' খানেক ক্ষতচিহ্ন ফুটে ওঠে। কুঞ্চনভরা মুখ নিয়ে সে পরম ঘৃণায় ঘরের মেঝেতেই খানিকটা থুথু ফেলে বলে—মানুষ, আদমি, ইনশান—ফুঃ, দুনিয়ায় একটাও নেই!

তারপর স্বর নামিয়ে খানিকটা খেদোক্তির মত জবাব দেয়—অথবা যেন নিজেকেই বলে—শুধু এই একটা আফসোস, মানুষ হয়ে জন্মালুম, কিন্তু মানুষের সঙ্গে থাকতে পেলুম না। থাকব কি—চোখে একটা মানুষই দেখলুম না!

—যাদের খুন করিস, তারা কে?

—তারা? শের তার পুরনো জবাব আবার বলে—গিরগিট্।

গিরগিট্। সব গিরগিট্! উচ্ছিষ্ট নকল সুর আর পচা সরাবের মিন্‌মিনে স্রোত থেকে উঠে এসে তারা যখন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রামজানী মিঞার গলি পার হয়, তখনই শের• ছোরা হাতে পথ আগলে দাঁড়ায়। মালার মত কোঁচানো তাদের গলার চাদর ফাঁসির দড়ির মত চেপে ধরে। কেউ প্রতিবাদ করে না। কোন মিঞার দেহে তখন প্রাণের এন্‌জিন্ চলে না। সব যেন ম্যাচিসকা টিরেন। দেশলাই বাক্স সাজানো রেলগাড়ি। অদৃশ্য প্রবৃত্তির সুতোর টানে চলছে। লালসার সুতোয় টান পড়তে এ মহল্লায় ছুটে এসেছিল, আবার সামাজিক কর্তব্যবোধের সুতোয় টান পড়তে বাড়ি ফিরছে। এরা মানুষ! এদের জন্য খুদাতাল্লা ত্বনিয়া সৃষ্টি করেছে? শেরের বহুলগবেষিত বিবেক প্রতিবাদ করে—না, মানুষ নয়, গিরগিট্। কোরাণ শরিফে আছে, গিরগিট্ ধ্বংস কর। শের তাই করে। আল্লামিঞার সাধের ত্বনিয়াকে সে কলঙ্কমুক্ত করে। সর্বাংশে পাক্ ও সাক্ করে। এতে তার কোন বাছবিচার নেই। হিন্দু মুসলমান আংরেজ আম্‌রিকান নেই।…খুদা হাফিজ!

শের সবেগে মাথা ঝাঁকানি দেয়—সব গিরিগিট্। সব—এভরিবাডি—

যতটা উত্তেজনা নিয়ে শের মাথা ঝাঁকায়, মন্তব্য করে, তার চেয়ে

একটা বড় সংশয়ের ছাপ হঠাৎ তার মুখে রেখাপাত করে। সকলেই কি গিরগিট্ ? না, অন্তত মল্লিক বাড়ির ঐ বাবুটি নয়। লছমীর কাছে পরাজয়ের কথা লুকিয়ে গেলেও নিজের কাছে শের সেই পরাজয়কে তার জীবনের একটা স্বুবর্ণ অধ্যায়স্বরূপ চিহ্নিত করে রেখেছে।

ভোগ করতে জানে মল্লিক বাড়ির বাবু। কি নাম যেন—সরোজবাবু? হাঁ, সরোজবাবুই! কুস্তিগীর পালোয়ান। একটি আফগানী রদ্দায় যে কোন শক্ত-সমর্থ মানুষের মগজ তার খোপড়ির কোঁড়ে থেকে গলা ঘিয়ের মত সড়কের কিনারায় গড়িয়ে দিতে পারে। অথবা একটি ধোবি-পটে সওয়া দু'মন ওজনের নরদেহ হাড্ডিহীন শিককাবাবের রেডিমেড্ মাংসপিণ্ডে পরিণত করতে পারে

সেদিন প্রায় মাঝরাতের কাছাকাছি সরোজবাবুর সঙ্গে শেরের রামজানী মিঞার গলিতে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। শাওনী বাঈর ঘর থেকে গান শুনে ফিরছে সরোজবাবু। স্বুরা সাগরে ডুব দিয়ে যেন। কিন্তু সাগরেই ডুবেছে, ছটাকে মাতালের মত ধেনো কি মহুয়া পচুই-এর খানা-ডোবায় পাঁক মেখে ফিরছে বলে মনে হয় না। শের অন্ধকারে তার অভ্যস্ত দৃষ্টির অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারে, সরোজবাবু এখন আশমান জমিন বরাবর দেখছে—কিন্তু দেখছে যেন স্বুদূরের নির্লিপ্ততা নিয়ে। যেন কোন ময়ূরসিংহাসনারূঢ় বাদশাহ দীনদুনিয়ার ধূলিমলিন পথ সোনার গালিচায় মুড়ে দেওয়ার খোয়াব দেখছে।

শের নিয়মিত অভ্যাসের দরুন পথ আগলাল। মল্লিকবাবু থমকে দাঁড়াল। মল্লিকবাবু নয়—সরোজবাবু। মল্লিক বাড়ির

অসংখ্য গিরগিটের মধ্যে একটাই তো মানুষ। রইসীর পীর পয়গম্বর।

সরোজবাবু থমকে দাঁড়াল, যেন তার খোয়াব-রঙীন দৃষ্টি একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ছায়াপাতে ক্ষণেকের জন্য কুণ্ঠিত হ'ল, পরক্ষণেই বদান্য কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—কি চাই?

—খুন! শেরের কেমন লোভ চেপে গিয়েছিল। সরোজবাবুর বাদশাহী নেশা থেকে সে যেন লোলুপের মত খানিকটা কেড়ে নিতে চায়।

নিমেষের ঝটকায় শেরের হাতের ছোরা গলির অন্ধকারে ছিটকে গেল। শের অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। প্রথম পরাজয়। কিন্তু পীরের পয়জারের আঘাতের মত এ লাঞ্ছনায় এক অপার্থিব আনন্দের স্বাদ পেল সে।

সেই অপ্রস্তুত মুহূর্তে সরোজবাবু পকেট থেকে টাকার ব্যাগ বের করে একটা দশ টাকার নোট শেরের হাতে গুঁজে দিয়ে বললে—চলবে এতে?

সে নোটখানা শের সাউদের গোলা লুঠ করা টোয়েনটিত্রি হানরেডের মত উড়িয়ে পুড়িয়ে দেয়নি। জুম্মার দিনে বড় মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ফকিরদের দান করেছে আর বিনিময়ে দোয়া কুড়িয়েছে।

হাসি আর সাধারণ বাক্যালাপের মাঝে শেরের আচম্বিতের অন্যমনস্কতা লছমীকে বিহ্বল করে তোলে। বুঝে ওঠা যায় না লোকটাকে। কাছের মানুষ কাছেই থাকে, কিন্তু তবু মনে হয় একটা মরুসদৃশ ব্যবধান এসে দুজনের অন্তরঙ্গতায় স্পর্শটুকু হঠাৎ

যেন নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যায়। সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে দুর্বোধ্য ব্যবধান ছায়াপাত করে।

শেরের মুখের ভূমগুলে যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের এক দানবাকৃতি জীব পরিভ্রমণ আরম্ভ করে। ভয়-ভয় করে লছমীর। কি ভাবছে লোকটা! এখন ও হয়তো অনায়াসে লছমীর গলা টিপে হত্যা করতে পারে। একান্ত অকারণেই পারে। কিম্বা হয়তো একটা অকিঞ্চিৎকর প্রলোভন বশে খুন করতে পারে। হয়তো দেখতে চায় মৃত্যুর কবলে পড়ে লছমী কেমন আচরণ করে। গিরগিটের মত, না খুদাতাল্লা নিজের সাধের ডুনিয়াকে সাজাবার জন্য যে বিশেষ ধরনের আওরাৎ সৃষ্টি করেছে, তার মত।

ভাবতে ভাবতে লছমীর ভয় আরো বেড়ে যায়। শেরের মনের এক লোলুপ দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়ে কথা বলে সে—কাল রাতে একবার এলি না কেন?

একপ্রস্থ ঘৃণার প্রলেপে শেরের স্থুল নাসিকাগ্র স্থুলতর হয়—কেন! রাতে কি আমি এই নরকে ঢুকি?

শের কথা বললে বটে, লছমীর কথার যথোচিত জবাবও দিলে। কিন্তু তখনো সে অন্যমনস্ক। সরোজবাবুর কথা ভাবছে। বড় ইচ্ছে হয়, সেলাম ওস্তাদ বলে লোকটির পায়ে গড়িয়ে পড়তে। ইচ্ছে হয় দু'বোতল পাকী বিলেতী মদ নিয়ে গিয়ে তার আভিজাত্যের দরগায় নিয়াজ (পুজো) দেয়, আর বলে—হুজুর, ওস্তাদ, গুরু, আমার আদর্শের পয়গম্বর, একটু প্রসাদ করে দাও।... বীরের উচ্ছিষ্ট পীর পয়গম্বরের সিরনীর মতই পবিত্র। বহু পুণ্যে ভাগ্যে জোটে। শেরের তাচ্ছল্যজনক উত্তর গায়ে না মেখে লছমী আবার বলে—কাল তোর জন্যে মাংস আনিয়েছিলাম, যদি একবার

ভুল করেও আসতিস তুই? এখনো আছে—হঠাৎ সস্তায় পেয়ে গেলুম, তাই তোর জন্যে নিয়েছিলুম, খবর দিতে পারিনি।

—হা আল্লা, এতক্ষণ তাহলে বলিসনি কেন! দে চট্‌পট্‌ ফৌরন। তারপর নিজের স্বভাবসুলভ অশ্লীল ভাষায় একটা রসোক্তি করে শের শেষের দিকে বলে—শুধু গোস্ত না রোটিও রেখেছিস?

—আছে, বাসি কিন্তু—

—তা' হোক, তুই-ই কি খুব তাজা আছিস? তোর চেয়ে বেশি বাসি না হলেই হল!

লছমী মুখটিপে হাসে। দুর্দান্ত গুণ্ডাটাকে বশ করার ওষুধ সে জানে। পোষা ভেড়ার মত নিজের সবুজ মনের চারণভূমিতে ধরে রাখতে পারে। এ শুধু সে-ই জানে। মনসুরগঞ্জ পল্লীর চারশ' পতিতার মধ্যে লছমীই কেবল পেরেছে। রূপ দিয়ে নয়, গুণ দিয়ে তো নয়ই, কি দিয়ে পেরেছে, তা সে জানে না। ভাবতে সাহস হয় না। তবু প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে, সে পেরেছে। পরাজিত নারীজীবনে বিপুল বিজয়ের আস্বাদ পেয়েছে।

লছমীর মৃদুহাসির তুলি বোলানো মুখ দেখে শেরের সন্দেহ হয়। সন্দিগ্ধ সুরে প্রশ্ন করে—হাসছিস কেন! গোস্ত রোটির লালচ দিয়ে মজাক্ করছিস? তারপর কতকটা রাগত ভাবে বলে—হাল্কা চিজ নিয়ে যত খুশি তামাশা কর, কিন্তু খিদের মুখে এ'সব মজাক্ ভাল লাগে না।

তবু সে কথার শেষে খানিকটা নৈরাশ্যজনক আশা নিয়ে ঘরের কোণের দিকে তাকায়। না, ঠিক তামাশা বলে বোধ হয় না—কোণের দিকে শানকি চাপা কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে যেন!

শের আবার বলে—গোস্ত-এ বেশি তিতা (ঝাল) দিসনি তো?

মিরচাই আমি মোটে বরদাস্ত করতে পারি না। শূয়ারকা বাচ্চা গন্নি হোটেলওয়ালা রসুই করবে কি, শুধু মিরচাই গুলে ঢেলে দেয়। ঝালের মুখে খাসসী বকরীর ফারাক বুঝতে পারি না।

লছমী উত্তর দেয় না। পরিবেশনে মন দেয়। ঘরের মেঝেয় খানিকটা জায়গায় জলহাত বুলিয়ে পিঁড়ি পেতে দেয়। ঝকঝকে কাঁসার থালায় খানকয়েক রুটি, থালার পাশে কলাইকরা বাটিতে একবাটি মাংস আর তার পাশে একঘটি জল দিয়ে বলে—আয়, খেতে বস?

হাড়সুদ্ধ একটুকরো মাংস অর্ধমুদিত চোখে চর্বণ করতে করতে শের বলে—বল শালী, আওরাতের প্যার মরদ কি করে বোঝে?

—তুই বল না, তোদের কথা তো তোরাই বুঝবি, তোরাই বলবি? লছমী সকৌতুকে প্রতিপ্রশ্ন করে।

হাড় না ফেলেই শের মাংসের টুকরোটা ভক্ষণ করে; তারপর ধীরে-সুস্থে দু'চুমুক জল খেয়ে, একটু তৃপ্তি নিয়ে বলে—আশীককে (প্রেমাস্পদ) সে যখন গোস্ত রেঁধে খাওয়ায়। মনে হয়, নিজের কলিজাটা মুহব্বতের আগুনে পাকিয়ে খেতে দিয়েছে।

—লছমী! খেতে খেতে শের গভীর সুরে ডাকে।

বিশিষ্ট সুরের এই সম্বোধন লছমীর কানে ঢুকলে সে কেমন মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে—যেন কোন চিরনিদ্রার পরীস্তা থেকে সে জবাব দিলে—বল গুণ্ডো!

শের একটু নীরব থেকে বলে—লছমী, আল্লামিঞা বেহেস্তের বোডিং হাউসে তোর জন্যে সিট্ রিজার্ভ করে রেখেছে।

লছমী অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে হাসে। আরো খানিকটা মাংস

প্রায়শূন্য কলাইকরা বাটিতে ঢেলে দিয়ে সঙ্কুচিত স্বরে জিজ্ঞাসা করে—আমি স্বর্গে যাব ! খারাপ মেয়েরা স্বর্গে যায় ?

—আলবাৎ যাবি। শের মাংসের বাটি থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। বাঁ হাতের রুটির টুকরো সশব্দে থালার ওপর নিক্ষেপ করে বলে—আমি কি ঝুট বলি ? জানিস আমি চার সাম নামাজ পড়ি। জুম্মা পড়তে খলিফাবাগের বড় মসজিদে যাই। বাচ্চা বয়েস থেকে ঈদের আগে রোজা রাখছি। এখন আমার ফরটিত্রি—এর মধ্যে কখনো নিয়ম ভাঙিনি।

লছমী দেখে কথা বলার আবেগে শেরের আহার বন্ধ হয়ে গেছে। তার ডান হাতখানা জোর করে মাংসের বাটিতে নামিয়ে দিয়ে সে বলে—হয়েছে, হয়েছে ! দেখছি নিজের গুণ গাইতে তোর জোড়া নেই ?

—আমি কি ডরপোক, না অন্য কারো পরোয়া করি ? আমার তারিফের ঢাক পিটতে পয়সা খরচ করে ঢুলি রাখি না। পলেটিকল সাইনবোর্ডও মাথায় নিয়ে বেড়াই না।

—নে খা, কথা বন্ধ কর বলছি ! বাবাঃ, কি কথায় কি এসে পড়ে, যেন তুবড়িতে আগুন ছুঁইয়ে ফেলেছি ? এত বকতে তোর ভাল লাগে !

—ভাল লাগে ! শের আবার গুছিয়ে কথা বলার জন্য প্রস্তুত হবার চেষ্টা করে।

কিন্তু তার আগে লছমী ধমক দিয়ে ওঠে আবার !

—আচ্ছা, আচ্ছা—। শের এবার নীরব হয়। একখণ্ড রুটি আর একটি মাংসের টুকরো যথাস্থানে নিক্ষেপ করে পূর্ণ স্তব্ধতার আবরণে সেটি চর্বণ করতে থাকে।

হঠাৎ এক সময় খাদ্যের পিণ্ডটা মুখের এক নির্জন প্রান্তে চালান করে দিয়ে শের বলে—আফসোস!

—কেন!

—আফসোস!

—শুধু এক কথা! কিসের আফসোস, তাই বল না?

মুখের ভেতরকার খাদ্যাংশটাকে বারকয়েক জিভ ও দাঁতের সক্রিয় পরিচালনায় জঠরে চালান করে দিয়ে শের বলে—তুই গোস্ত খাওয়া ছেড়ে দিলি লছমী, একেবারে ভদ্দর ঘরের বেবার মতন?

বেবা অর্থাৎ বিধবা শব্দটা লছমীর কানে বাজে, সত্বর প্রতিবাদ করে সে—মাংস ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু মাছ তো খাই?

—কিন্তু গোস্ত ছাড়লি কেন, কতদিন তোকে পুছতাছ করলাম—শের একটু দুঃখের সঙ্গেই বলে—সে কথার জবাব দিলি না, গোস্তও আর খেলি না। আগে তো হানিফ কসাইর কাছ থেকে রোজ গোস্ত নিয়ে আসতিস? আজকাল বুঝি ঝগড়া হয়েছে?

আজও জবাব দেয় না লছমী। বার কতক খুঁচিয়ে জবাব না পেয়ে, শের দু'পাটি দাঁত মেলে বোকার মত অবুঝ হাসি হাসে—তার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে মাংসের কুঁচি কাঁটার মত বিঁধে আছে।

শেরের বিশ্রী হাসিতে বিরক্ত হয়ে লছমী বলে—শুধু শুধু হাসছিস কেন, পাগল নাকি?

—বুঝেছি!

—কি?

—বুঝেছি গোস্ত খাওয়া কেন ছেড়ে দিয়েছিস! দিনে রাতে দু'চারটে কাঁচা মানুষের গোস্ত খেয়ে তোর খাসসীর গোস্ত-এ অরুচি ধরে গেছে?

শেরের অশ্লীল মন্তব্য লছমীর কানে তেমন অশ্রাব্য শোনায় না। সে-ও এই অশ্লীল কৌতুকে যোগ দিয়ে বলে—আমার কাঁচা মানুষ খাওয়ার কথা ভেবে তোর বুঝি খুব হিংসে হয়?

হা-হা করে হাসে শের। প্রাণখোলা হাসি। ঈর্ষার আগুনে দগ্ধ হওয়া মানুষের মত পোড়া কণ্ঠের কষ্ট-কাতর হাসি নয়।

হাসতে হাসতেই শের জবাব দেয়—হিংসে কেন হবে? যারা কাঁচা গোস্ত-এর লোভে তোর কাছে আসে, সে সব গৃধের কাছে মরদ আওরাৎ সব বরাবর। ঐ সব ছুছুন্দরগুলো পোকাভরা পুকুরে আস্নান করে বিমারীর ডিপু হয়ে ফিরে যায়। লছমীর কাছে কেউ আসে না, পায়ও না। লছমীকে কেউ চিনতে চায় না। পারেও না। তাই লছমী—

মাঝখানে লছমী বাধা দিয়ে বলে—থাক হয়েছে! ভাল খাবার পেয়ে আমার তরফে খুব বহস করছিস, কিন্তু তোর কথা শুনছে কে? তার চেয়ে পার্কে গিয়ে মিটিং ডেকে বেশ্যাদের বিষয় ভাষণ দে, তাতে নাম হবে। খবরের কাগজে তোর ছবি বেরুবে।

লছমী নানা ভাষায় শেরের কথার প্রতিবাদ করে, কিন্তু তার অন্তরে শেরের মুখে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ জুম্মার দিনে পীরের দরগায় সাজানো মোমবাতির মত জ্বলজ্বল করতে থাকে।

বোধহয় একটু শ্বাস নেওয়ার প্রয়োজন হয়, আহারও গুরুতর হয়ে গেছে, তাই সামান্য বিরতি দিয়ে শের প্রশ্ন করে—আজতক্ তোর নাম কোন মিঞা জিগ্যেস করেছে? কোন দিন তোর ভালাবুরার কোন সওয়াল? তুই কে, কোথা থেকে এলি—এই সব? কেউ একটু দরদ দেখিয়েছে?

—না। এত প্রশ্নেও লছমীর উত্তর সংক্ষিপ্ত। মাত্র একটি শব্দ, না।

—কোন কথা নয় ?

লছমী হাসলে—তুই আমায় হাসালি গুণ্ডো ! এত সময় কার হাতে আছে বলতো ? তাছাড়া মে' মানুষের ঘরে বেশিক্ষণ বসতে হলে বেশি পয়সাও যে দিতে হয়।

শেরের সব প্রশ্ন তখনো শেষ হয়নি—তোর নাম জানতে চেয়েছে কেউ ?

—মনে পড়ে না—লছমী আবার হাসে—তাছাড়া যারা আসে তারা একজনের ঘর বন্ধ দেখলে অন্য একজনের ঘরে যায়, এখানে নামের দরকার কি, নামের তফাতেই বা কি আসে যায় ?

শেরের আহারপর্ব শেষ হয়েছে, উঠতে উঠতে বলে—তবে তোর গেছে কি রে ? বাজারের আওরাৎ হয়েও তুই পীরাঈন থেকে গেলি !

—আর খুনে গুণ্ডা, তুই—লছমী বোধহয় কৌতুক করে।

—ফকির ছিলাম, তাই আছি। লছমীর কৌতুক শের ধরতে পারে না।

মুখ ধুতে গিয়ে শেরের পুরনো খুঁৎখুতানিটা আবার মনে পড়ে যায়—খেলুম তো খুব, কিন্তু তৃপ্তি হ'ল না। এমন সুন্দর রান্না তুই মুখে দিলি না। গোস্ত আর কোনদিন খাবি না ?

—না।

—সত্যি ? কসম—?

প্রতিজ্ঞা করে লছমী। শেরের দিব্যি করে বলে—যদি কোনদিন মাংস খাই, সে আমার মুখে তোর গায়ের মাংস হয়ে উঠবে।

বলেই লছমী জিভ কাটে। দিব্যিটা না করলেই ভাল ছিল। বা অন্য কোন 'কিরিয়া' নিলেই পারত সে। শেরকে নিয়ে এতখানি

বাড়াবাড়ির কি প্রয়োজন ছিল তার? চুপ করে থাকলেই হ'ত। পাগলী জেলেখার অভিযোগের উত্তরেও তো সে চুপ করে ছিল!

হানিফ কসাই। বারাহাটের সাপ্তাহিক হাট থেকে খাসী বকরী কিনে এনে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে মাংস বিক্রি করে। এবারও যথানিয়মে কয়েকটি নধরকান্তি খাসী আর গোটা সাতেক বুড়ি পাঁঠী কিনে এনেছে সে।

তবু এ খাসীটা যেন ঠিক হাটের সওদার মত নয়। কালো কুচকুচে সুপুষ্ট সুশ্রী পশুটাকে দেখে হানিফ মনে মনে স্থির করেছে আগামী বকরঈদ পর্বটা সে এবার উপযুক্তভাবেই সম্পন্ন করবে।

বিবি জেলেখারও পছন্দ হয়ে গেল, হানিফকে বললে—এ খাসীটা আমায দিয়ে দাও, পুষবো?

হানিফ জিভ কাটে, শঙ্কিত মুখে জবাব দেয়—তাওবা, তাওবা, ও পাপের কথা বলিস না বিবি!

—কেন? জেলেখার পাকা তাম্বুলরাগরঞ্জিত কালো অধরোষ্ঠ অভিমানের আতিশয্যে স্ফুরিত হ'ল—সাদি হওয়া থেকে তো কোনদিন কিছু চাইনি! তারপর অশ্রু নির্গমেব জন্য খানিকটা বিরতি দিয়ে আবার বললে—সব আমি চিরদিন মুখ বুজে সয়ে যাচ্ছি। যেমন তোমায় সইছি, যেমন সইছি তোমার তাড়ি মদ আর মে'মানুষের নেশা—

—না না, তা নয়,—হানিফ দ্রুত বাক্য-প্রলেপে জেলেখার অশ্রুপ্রবাহে সান্ত্বনার বাঁধ দেবার চেষ্টা কবে—আমি কি তাই বলছি। জেলেখাবিবি, তুই কি বাজারেব আওরাৎ, যে মিঞার সঙ্গে শুধু চাঁদি আর রোটির সম্বন্ধ? তুই আমার কলমাপড়া বিবি।

কোরানের হলফ নিয়ে সাদিকরা বিবি। তোকে ছাড়লে দেনমোহর গুণতে আমার আব্বাজানের গোরের মাটিও নিলামে চড়বে।

নিজের মূল্যমাহাত্ম্য অনুভব করে জেলেখার মুখের ভাব কতকটা উজ্জ্বল হয়। সে হানিফের রোমশ বাহুতে হাত বুলিয়ে বলে—আমি তো কোনদিনই কিছু চাইনি! আজ বলছি খাসীটা আমায় দাও, পুষবো?

আবার তাণ্ডবা করল হানিফ, জিভ কেটে বললে—আমি যে ওটাকে আল্লামিঞার নামে কুরবানী দেব বলে ভেবেছি। এই সামনের বকরঈদেই—

জেলেখা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়। চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর আবার পুরনো সুরে আব্দার ধরে—তা হোক, কুরবানী না দিয়ে পুষলে দোষ হয় না।

—না না না—হানিফের ধর্মভীরু মন কিছুতেই সম্মত হতে চায় না। মস্করা বা সোহাগ জানিয়ে দায় ছাড়ানোর সহজ পন্থাটাও মনে পড়ে না।

হানিফ সজোরে মাথা নাড়ে, প্রবল আপত্তির সুরে বলে—তুই চাইলে একটা কেন পাঁচটা খাসী তোর দরবাজায় হাতীর মত বেঁধে দেব। কিন্তু এটা নয় বিবি। খুদার নামের শিলমোহর যার ওপর পড়েছে তা'তে লালচ দিস না।

জেলেখা জিদ ধরে। হানিফ তাকে মানাতে পারে না। মানতে চায় না জেলেখা। কসাইর ঘরকরা বিবি খুদাতালার মানসম্ভ্রম রক্ষায় কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা দেখায় না। খাসীটাও তখন কি করে খোঁয়াড় ছেড়ে এসে জেলেখার শাড়ির একটা প্রান্ত কামড়ে ধরেছে।

সেদিকে হানিফের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জেলেখা বলে—খুদা খুদা করছ, দেখ তার হুকুম! তুমি আমায় জবাই না করে এটাকে কাটতে পাবে না। ব্যাস—

আবার ঘাড় নাড়ে হানিফ। কিন্তু কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। ধর্মের সংস্কার, জেলেখার আব্দার আর উপস্থিত পশুটার বিস্ময়কর আচরণের মধ্যে তার মানষিক বিরোধ বাধে। হানিফ বুঝতে পারে না, কি তার কর্তব্য। নিরাকার খুদার কোন প্রত্যক্ষ হুকুম পরওয়ানা আসে না। কিন্তু লোকে বলে, আল্লার ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুক্ত থাকে না কখনো। হয়তো পশুটার দেহে কোন খুঁৎ আছে। তার পাগুলো টেনে, কানে মোচড় দিয়ে, পেটে থাপ্পড় মেরে হানিফ পরীক্ষা করে। শেষ পর্যন্ত তাকে হাঁ করিয়ে মুখের ভেতর পর্যন্ত দেখে নেয়। কিন্তু দূষণীয় কিছু খুঁজে পায় না।

তবু বিশেষ আপত্তি না করে বিষয়ের নিস্পত্তির ভার জেলেখার ওপরই ছেড়ে দিয়ে হানিফ বলে—আমি আর হাঁ বলব না, না-ও বলব না, তুই-ই ভেবে দেখ বিবি!

হয়তো জেলেখা এ নিয়ে অনেক ভেবেছে, অথবা তার কাছে এ কোন চিন্তার বিষয় নয়। তবু যদি তেমন অঘটন ঘটে তার সমস্ত দায়িত্ব তার। সমস্ত দায় তার। সমস্ত গুনহা (অপরাধ) তার। এর সঙ্গে সে হানিফকে জড়াবে না। কোন অজুহাতেই নয়।

একমুখী স্রোতের মত নিজস্ব মতামতটিকে অবাধ যুক্তির আয়নায় প্রতিফলিত করে দেখে নেয় জেলেখা, তারপর বিশেষ বাক্যব্যয় না করে দৃঢ় কণ্ঠের ভূমিকা-মাখানো স্বরে বলে—যদি কোন গুনহা হয়, তা আমার।

তবে তাই হোক। হানিফ আর প্রতিবাদ করে না। সন্ধ্যা সমাগত। এ সময়টা কর্মক্লান্ত দিনের গ্লানি প্রক্ষালন করে না নিলে পরের দিন সে কাজ করতে পারবে না। এখন তার ঘণ্টা কয়েকের মত নিশ্চিত অবসর চাই। পারিবারিক আর ব্যবসায়িক নীরস-নির্মম চিন্তাসূত্রগুলো তাড়ির সাদা ফেনায় ধুয়ে না নিলে আগামী-কালের দৈনন্দিনতা দুর্বহ বোধ হবে। তাড়ির রসে পূর্ণাঙ্গ স্নান করতে চায় হানিফ। ততটা সামর্থে কুলোয় না। মনে মনে বলতে ইচ্ছে করে—

হাম যব মর যায়েঁ তো,
তাড়কে নিচে শুলা দেনা ;
না-পাক পানি নঁহী,
পাক তাড়িসে গোসল করবানা ;
কপড়েকা কফ্‌ফন নঁহী,
তাড়কে পত্তেসে ঝাঁপ দেনা—

অধিক চিন্তার প্রয়োজন কি! মৃত্যুর পর আমার দেহ পবিত্র তাড়ির রসে সিক্ত করে, তালপাতার কফিন মুড়ে, তালগাছের ছায়ায় সমাধিস্থ করো।

কিন্তু এতটা খুশকিসমৎ হানিফ নয়। তার ভাগ্যলিপিতে তাড়ির ফেনায় পূর্ণাঙ্গ স্নান লেখা নেই। যতটুকু আছে, তা তালপাতার দোনায়-ভরা গণ্ডা দু চারেকের এক-আধ-পাত্র মাছিচাটা বাসি রস। আর লক্ষ অপরিচিত ব্যক্তির সকাম উৎপাতে জর্জরিত নারীচর্মের সামান্য আপাত-কোমল সংস্পর্শ। আশা-শীতল জীবনে কিঞ্চিৎ উত্তাপ সংগ্রহ। চটের পর্দাটাঙানো জেলেখা বিবির ঘরের একেশ্বরতা নয়, বারোয়ারি মুক্তাঙ্গনে খানিকটা বৈচিত্র্যময় স্নায়ু আস্ফালন।

এ'টুকু জেলেখাও স্বীকার করে নিয়েছে। অবশ্য সে হানিফের জীবনে নিজের বহুমূল্য অস্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন বশতঃ মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করে, কিন্তু অন্তর থেকে বাস্তবিকই মেনে নিয়েছে। জেলেখার আন্তরিক অনুমোদন লাভের পর থেকে হানিফ তার প্রতিবাদকে আর আমল দেয় না। জেলেখার প্রতিবাদে বিরক্ত হয় না সে, বরং এটা তার ভালই লাগে। মাতালের মুখ থেকে মদের পেয়ালা ছিনিয়ে নেওয়ার পর আবার ফিরিয়ে দিলে সে যেমন পূর্বাপেক্ষা বেশি সমাদরে পানীয়টা গ্রহণ করে, ঠিক তেমনি, যেদিন জেলেখা সাভিমান কলহের পর সম্মতি দেয় সেদিন যেন হানিফ তার সান্ধ্য উৎসবে আরো প্রবল উৎসাহ বোধ করে।

জেলেখা আজ খুশি মনেই বললে—যাচ্ছ! চারশ' বিবি পথ চেয়ে বসে আছে, না?

জেলেখার গালে একটা আদরের টোকা দিয়ে হানিফ জবাব দিলে—বিবি আমার চারশ', কিন্তু বেগম একটাই।

—তাই বটে? যত সব তোমার মুখের কথা, নয়তো সামান্য একটা খাসী নিয়ে যে কাণ্ডখানা করলে—ঘেন্নায় মরে যাই!

কুপিত হওয়ার ভঙ্গি করে জেলেখা। হানিফ তাকে কাছে টেনে নিয়ে গালে একটি চুমুর ছাপও এঁকে দেয়।

একটা পুরনো দুর্গন্ধে জেলেখার মনে পড়ে গেল, বললে—কতদিন থেকে বলছি, মুখের পচা দাঁতগুলো তুলিয়ে দাও, তা তোমার কানে যায় না! বাজারের মেয়েগুলো তোমায় সয় কি করে, কাছে ঘেঁষতে দেয়? ঘেন্না করে না তাদের!

—তাই সয় বটে—হানিফ হাসে—আমায় সয় না রে, আমায়

সয় না, আমার ট্যাঁককে সয়। ট্যাঁকে টাকা বেঁধে নিয়ে গেলে গরু শুয়োরকেও সইবে।

—কিন্তু তুমি দাঁত তোলাবে কি না?

—হ্যাঁ, সামনের তেহ্বারটা (পর্ব) কাটলেই—কথা অসমাপ্ত রেখেই হানিফ জেলেখার অপর গালটি সোহাগের দুর্গন্ধময় স্পর্শে অভিষিক্ত করে।

আদরের টোকার ওপর দুটি উপরি পাওনায় জেলেখার অভিযোগ করার মত কিছু বাকি থাকে না। বিহ্বল হয়ে পড়ে জেলেখা। শুধু হানিফের বেরুবার সময় সে একবার বলে—বেশি রাত করবে না তো?

হানিফ ফিরে তাকায়। বীভৎস রুগ্ন দাঁতগুলি উৎকণ্ঠ হাসির চাপে ঠিকরে বেরিয়ে আসে।

হানিফ পিছু ফিরে বলে—মাঝরাতের বিবিরা সব সরকারী ডিরেন, আমি ততক্ষণ থাকি কোনদিন? তারপর সে জেলেখাকে সাদর নির্দেশ দেয়—দরজার শেকলটা আল্গা করে দিয়ে রাখিস, তাহলে তোকে আর দোর খোলবার জন্যে উঠতে হবে না; আমি বাইরে থেকেই খুলে নেব।

দেখেশুনে জেলেখা খাসীটার নাম রাখলে দামড়িলাল। দামড়িলালের দাপটে জেলেখা অস্থির। গলায় পিতলের ঘুঙুর বাজিয়ে দামড়িলাল নেচে বেড়ায়। কাঁচ-প্রবালের মালা দুটি ঘুঙুরের শব্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দুলদুলিয়ে নাচে।

দামড়িলালকে আদর করতে করতে জেলেখা হানিফের দিকে তাকায়,

কৌতুকাত্মক শ্লেষোক্তি করে—বাড়িতে এত সুন্দর জলসার ব্যবস্থা থাকতে তুমি কিসের টানে যে বাইরে যাও, তা বুঝি না!

হানিফের মনমেজাজ আজকাল তেমন সুবিধের নয়। পর পর দুটো পশুমড়ক গেছে। কাঁচা মালের দাম আগুন। কিন্তু মাংসের দাম সে অনুপাতে বাড়েনি। খদ্দেরও অনেক কমে গেছে। এক সেরের গ্রাহক খোসামুদিতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পোয়াখানেক মাল নেয়।

এ এক নিত্যদিনের ঘৃণিত কারবার। ঘৃণিত দরবারই বলা চলে।

—ও বাবুমশাই, ও বড়েমিঞা প্রণাম, সালাম আলায়কুম! হুজুরকে আমি একসেরের কম গোস্ত দিতে পারি না। না-না, এতটা বেআদবী করতে পারব না আমি!

আরো কত কি যে বলে যেতে হয় অনর্গল। ঘৃণা জাগে নিজেরই ওপর। উদ্দিষ্ট বাবুমশাই অথবা বড়েমিঞার পরিচয় হানিফের অজ্ঞাত নয়। পয়সার তাকত থাকলে হানিফ ওদের বাবুর বদলে কুত্তুয়া বলে ডাকত, সেলাম দেওয়ার বদলে জুতো মারত!

এতেই কি শেষ? তারপর খাসীর ঝুলিয়ে রাখা ঠ্যাং টেনে মারামারি।—না হুজুর, আমায় মাফ করবেন। কসুর মাফ করবেন আমার। হুজুরকে আমি কিছুতেই আড়াইশ' গ্রাম গোস্ত দিতে পারব না। আমার গ্রাম-ফেড-মাটোন, হুজুরের জন্যে পুরো এক কে. জি. কাটছি?

অবশেষে এই মন কষাকষি আর টানাটানি মারামারির পর হয়তো আধ কিলো মাল বিক্রি হয়। এ বিক্রিতে এক পয়সা লাভ নেই। আসল নাফার রহস্য, যে বড় গোলাকার কাঠের টুকরোটা হানিফের সম্মুখে রাখা থাকে তার আড়ালে। গ্রাম-ফেড-মাটোনের বড় টুকরো খণ্ডিত করার সময় হানিফ সুকৌশলে বুড়ি পাঁঠীর অথবা বৃদ্ধ

বোকাপাঁঠার মাংস মিশিয়ে দেয়। এই সামান্য আসলের সঙ্গে যৎসামান্য ভেজালের সংমিশ্রণে লাভের ব্যবসা চলে না। কোনরূপে পেট চালানো। ভিক্ষের চেয়ে ঘৃণিত উঞ্ছবৃত্তি। ছিঁচকে চোরের কারবার।

ব্যবসায় এ ধরনের ভঙ্গযোগ কতদিন চলবে কে জানে! এর শেষ পরিণতি হানিফ অনুমান করতে পারে না। হয়তো দোকান একদিন তুলে দিতে হবে। রহস্যময় কাষ্ঠখণ্ডটিতে জেলেখা উনুন ধরাবে। ছোট বড় ছোরাছুরিগুলো মরচে পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। তারপর পুরনো লোহার দরে বিক্রি করে যে সামান্য দু'চার আনা পয়সা পাওয়া যাবে সে পয়সায় হানিফ বিড়ি কিনে ধোঁয়া করে উড়িয়ে দেবে।

ব্যবসার আসন্ন দুরবস্থার কথা চিন্তা হানিফের ভবিষ্যৎ দর্শনের পর্দায় যখন ধোঁয়ার কুণ্ডলির মত প্রতিফলিত হচ্ছে, ঠিক সেই সময় দামড়িলালকে নিয়ে জেলেখার এ আদিখ্যেতা হানিফের ভাল লাগে না।

হানিফ তিক্ত কণ্ঠে জবাব দেয়—

নিজের পেটে তো একটা ইঁদুর বাচ্চা পর্যন্ত ধরতে পারলি না, তাই একটা খাসী নিয়ে তোর যত নাচানাচি! তুই মরলে কি দামড়িলাল তোর গোর-এ মাটি দেবে?

—তুমিই কি দেবে? জেলেখা প্রতিপ্রশ্ন করে, তারপর সে অকারণ অভিমানে ভেঙে পড়ে—কিছুদিন থেকে দেখছি, তোমার যেন কি হয়েছে? তুমি আজকাল আমায় সহ্য করতে পার না, আমার দামড়িলালকেও সইতে পার না। কেন?

হানিফ সমান তিক্ততার সঙ্গে উত্তর দেয়—কেন আবার। পেটের

নাড়ি যখন শুকিয়ে যায়, তখনও কি সোহাগ আর আদিখ্যে তার নাড়িগুলো বেঁচে থাকে ?

—সময় একটু খারাপ পড়েছে বলে কি তুমি আমায় এত অবহেলা করবে ? খিদে আমারও আছে, কিন্তু আমি তো তোমায় সেজন্য দোষ দিই না। তোমার সব অত্যাচার চিরদিন মুখ বুজে সয়ে যাচ্ছি। কোন গুনহা, কোন পাপ তুমি না কর, তবু তো তোমায় ঘেন্না করি না ? তবু তো রোজ দিন তোমার জন্যে আল্লার দোয়া ভিক্ষে করছি ?

—থাক থাক, অনেক লেকচার দিয়েছিস ! খুব শরিফ ঘরের বেটি তুই, তোর আম্মার কথা দুনিয়ায় কারো জানতে বাকি নেই।

একান্ত অকারণেই জেলেখাকে একটা রূঢ় আঘাত দিয়ে হানিফ বেরিয়ে যায়। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তিক্তবিরক্ত মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য হানিফ আজকাল খরচের প্রবাহটাকে আরো গভীর খাদে নামিয়ে দিয়েছে। তাড়ির লাব্‌নীর পর লাব্‌নী খালি হয়েযায়, পেট উপচে পড়ে ; তখনই হয়তো খানিকটা নেশার ঘোর আসে। তারপর নেশার ঝোঁকে এক বিবির ঘর থেকে বেরিয়ে কখন যে আবার অন্য বিবির ঘরে ঢুকে পড়ে, তা সে টের পায় না। 'মাঝরাতের বিবি তো সরকারী ডিরেন'—সেই ড্রেন থেকে হানিফ কোন্ মুহূর্তে গাত্রোত্থান করে তা স্মরণ করতে পারে না। তবে একটা কথা রোজই তার স্মৃতির পাতায় ছাপ রেখে যায়, বিবির ঘর ছাড়বার মুখে নজরানার হিসেব নিয়ে প্রায়ই হাতাহাতির উপক্রম হয়।

মানবীর তনুবিলাসের ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি মাংসের ওজনেই দেয় হানিফ। দিয়ে তখনকার মত নিষ্কৃতি নেয়, বলে—বিবি, কাল মার্কেটে আসিস, আধ কিলো গোস্ত দিয়ে দেব।

—হাঁ গোস্ত দেবেন আধ কিলো ! কি আমার পেয়ারের ভাতার গো ; ঝাড়া তিনঘণ্টা ধরে শরীর নিয়ে নেড়িকুত্তার মত টানাছেঁড়া—গোস্ত দেবেন আধ কিলো। ওঃ, যেন শিবিরাজ এসেছেন! যাও যাও, দরকার নেই আমার ঘোড়ার গাড়ি, হেঁটেই যাব বাপের বাড়ি। তোমার মত নাগরের আমার দরকার কি খানকীর পো? চাই না গোস্ত, নগদা কড়ি ধরে দাও, নয় তো ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব। ফেল নগদা কড়ি, নিয়ে চল চাগদার বাড়ি।

হানিফ ক্ষীণকণ্ঠে অনুনয় করে—শোন বিবি—লছমীবিবি—

—শুনব কি রে, হতচ্ছাড়া, শুনব কি? ও, ডাক শুনে পরাণে আমার শকুন উড়ে যায়! ফেল কড়ি মাখ তেল, আমি কি তোমার পর? সিঙ্গিল পয়সা দে, তোর বিবি। ডবল পয়সা দে, তোর বাপেরও বিবি।... পেরথম দিন এসে বড় যে সোহাগের গান শুনিয়েছিলি, বিবিজান ঘোমটা খোল, হাম তুম্‌হারা মুখ দেখেগা; আর মুখ যদি পছন্দ হোগা, হাম তুমকো বকশিশ দেগা। দে এবার বকশিশ, মুখ তো ঢের দেখলি, সবই তো দেখলি। কুত্তার মত শুঁকে-চেটে দেখলি!

হানিফ পায়ে ধরে। নেশার ফেনা ততক্ষণে বারবিলাসিনীর বাক্য-মার্জনায় তার মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে।

পায়ে ধরে হানিফ মিনতি করে। অনুনয় করে বলে—এত চ্যাচাস না বিবি, এমনি করে আমার খানদানী ইজ্জৎ কেড়ে নিস না। আধ নয় পুরো এক কেজি গোস্ত দেব তোকে—কাউকে বলিস না। ভাল গোস্ত, বাজারের সেরা ; গ্রাম-ফেড মাটোন।

এই বিনিময় প্রথাটাই আজকাল নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। কেউ আর নগদ মূল্যের জন্য হানিফকে তেমন বিব্রত করে না। হাতে সময়

থাকলে, নগদ গ্রাহকের ভিড় না থাকলে হানিফকে ঘরে ঢুকতে দেয়, বিনি পয়সা বেগার দেওয়ার মত ফাঁকি দেওয়া সুখ পরিবেশন করে এবং বিনিময়ে মাংস নেয়—এক আধ কিলো। তার ওপর বিগত রাতের উপরি সোহাগ স্মরণ করিয়ে দিয়ে খানিকটা মেটুলিও ফাউ নিয়ে যায়।

দুর্দান্ত পশুমড়ক আর হানিফের বিলসিতার মূল্য পরিশোধ করতে দামড়িলাল একদিন হারিয়ে গেল। প্রতিদিনের মত আজও হানিফ তাকে নিয়ে মার্কিটে গিয়েছিল।

ঘাসের আঁটি থেকে আগাছা বেছে ফেলছিল জেলেখা। হানিফের পদশব্দের সঙ্গে ঘুঙুরের নিয়মিত শব্দটা কানে না পৌঁছুতে সে সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে মুখ তুলে তাকাল।

গাম্ভীর্যময় শালকাঠের মত হানিফের পুরু ঠোঁটের চৌকাঠ ঠেলে খানিকটা বিব্রত হাসি বেরিয়ে এল। কিঞ্চিৎ আমতা আমতা করে বললে—কি দেখছিস, বিবিজান!

জেলেখা প্রশ্ন করলে—দামড়িলাল কোথায়? আমার লাল—

জবাবটা হানিফ প্রস্তুত করেই এনেছিল, তবু চট্ করে তার মুখে এল না। কালো রক্তের দাগ-মাখা ময়লা কাপড়ের মোড়ক জড়ানো ছুরি-কাটারি দাওয়ার একপাশে নামিয়ে রেখে বললে—বলছি। আগে একঘটি ঠাণ্ডা জল দে তো?

হানিফের কথা বা তার ক্ষুদ্র ফরমাসটুকু জেলেখার কানে গেল না। সন্ত্রস্ত সন্দেহভরা চোখদুটি সে হানিফের মুখের ওপর মেলে ধরে। অবসন্নতার খোলস জড়ানো হানিফের কুটিল মুখের অন্তস্তলে

জেলেখা যেন সবকিছু নিমেষেই দেখে নিলে। দুপুর সূর্যের চোখ ঝলসানো আঁচে জেলেখার চোখজোড়া জ্বলে ওঠে।

প্রবল উত্তাপ নিয়ে জেলেখা প্রশ্ন করে—বল, দামড়িলাল কোথায় ?

হানিফ যেন আপন মনেই ঘাড় নাড়ে—জানি না !

জানো না ! জেলেখা চিৎকার করে ওঠে—কসাই জানে না তার জানোয়ার কোথায় ! এ আমায় বিশ্বাস করতে বল ?

পলকে নোংরা কাপড়ের মোড়ক খুলে জেলেখা একটা ক্ষুরধার কাটারি বের করে হানিফের সামনে শান্ত পায়ে এগিয়ে এসে আবার বলে—দামড়িলাল কোথায় ? আমার বাচ্চা !

কাটারির গায়ে তখনো খানিকটা শুকনো রক্তের দাগ গলা আলকাৎরার মত জমে আছে। সেই চটচটে রক্ত জেলেখা তার ডান হাতের তর্জনীতে তুলে নিয়ে বললে—আমি চিনতে পেরেছি, এ আমার দামড়িলালের খুন !

হানিফ শুষ্ক কণ্ঠে সামান্য একটি শিথিল প্রতিবাদ করে—না—

জেলেখা উন্মাদনাপূর্ণ কঠোর কণ্ঠে বললে—আমায় রক্ত চেনাচ্ছ ! বাচ্চার বুকের রক্ত তার আম্মা চিনতে পারে না ?

হানিফের কলুসপুষ্ট প্রকৃতি থেকে সাহসের রশ্মি সম্পূর্ণ মুছে গেছে। জেলেখার হাতের নগ্ন কাটারির দিকে তাকিয়ে সে যেন কোন্ অন্ধকারে হারিয়ে থাকা শব্দমালা থেকে কথা খুঁজতে থাকে। কিন্তু বিশেষ কিছু খুঁজে পায় না, শুধু আর একবার একটি শব্দেরই পুনরাবৃত্তি করে—না—

এক চরম মুহূর্ত। দ্রুত আরোহণ, অবরোহণ আর বিলম্বিত লয়ে বাঁধা বিচিত্র জীবনসন্ধি।

পরবর্তি ইতিহাসটুকু সংক্ষিপ্ত। পাগলী জেলেখাকে চেনে সকলেই।

হানিফের সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডি ছিঁড়ে জেলেখা বৃহত্তর পৃথিবীর বারোয়ারি আঙিনায় বেরিয়ে পড়েছে। এখানে বারবণিতারা আজও তাকে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য এঁটো-কাঁটা এগিয়ে দেয়। ডাস্টবিনের ভোজসভায় নেড়িকুকুরগুলো তাকে নিজেদের দলে অবান্তর মনে করে না।

মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে মাছমাংসের দোকানঘরটা চমৎকার। স্প্রিং-এর কব্জাআঁটা দরজার কপাট সর্বদাই ভেজানো থাকে। উৎসুক ক্রেতা ভিন্ন পথচারীর নজরে ভেতরের রহস্য ভেদ হয় না। স্প্রিং-এর দরজায় শব্দ উঠতে হানিফ হাতের কাজে বিরতি দিয়ে আতঙ্কগ্রস্তের মত সেদিকে তাকায়।

কপাটের ফাঁক দিয়ে জেলেখা উঁকি দিল, তারপর ফিসফিস করে বললে—বলনা গো, আমার দামড়িলাল কোথায় ?

হাতের ইসারা করে হানিফ, ইঙ্গিতে বলে,এখান থেকে চলে যা।

অঙ্গুলিসংকেতই যথেষ্ট। আতঙ্কগ্রস্ত হানিফের চেয়ে যেন বড় ভীতির ছায়া সেই মুহূর্তে জেলেখাকে গ্রাস করতে আসে। জেলেখা ত্রস্তে বলে ওঠে—যাচ্ছি গো যাচ্ছি, আর আসব না। ছুরি দেখিও না গো, আমার ভয় করে। বেটাকে কেটেছ, তার মাকেও কাটবে তুমি।

চলে যেতে গিয়েও জেলেখা আবার ফিরে আসে। আবার দরজার কপাট ঠেলে। স্প্রিং-এর যান্ত্রিক শব্দে হানিফ সেদিকে তাকায়। জেলেখা বলে—হাঁ গো, তোমার নতুন বিবি, সগীরন বিবি,ভাল আছে তো ? সাদিতে সগীরন তোমায় অনেক টাকা দিয়েছিল, না ? চার পাঁচ হাজার—বাবা কত টাকা! ওর আগের মিঞা সরকারী পেয়াদা ছিল যে, রেলে কাটা পড়ে না মরলে হাকিম হ'ত একদিন!

জেলেখার কথাগুলো কৌতুক না কৌতূহল, হানিফ তা বুঝে উঠতে পারে না। তিন তাল্লাক দেওয়া পাগলটা যে কৌতুক করতে ভুলে গেছে, তা কিন্তু সহজেই অনুমান করা যায়। আর যখন সে রাস্তার গাড়িঘোড়া মোটরলরি অগ্রাহ্য করে আনমনে ডাস্টবিন ঘাঁটে, তখন যে কেউ বলবে, পৃথিবীর কোন কিছু সম্বন্ধে জেলেখার আর কোন কৌতূহল নেই। তার নোংরাঘাঁটা হাতে আবর্জনার কালিতে বিশ্বের করকোষ্ঠী রেখায়িত হয়ে গেছে।

তবু জেলেখার অবান্তর প্রশ্নে হানিফ কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। গাম্ভীর্য ধারণ করতে গিয়ে হেসে ফেলে। হাসি লুকোতে বিরক্তিতে মুখ গম্ভীর করে। অতঃপর সর্বপ্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে সুমুখের রক্ত-ধোয়া নালিটাতে খানিকটা পানের পিক ফেলে আনমনা ভঙ্গিতে সে-দিকেই তাকিয়ে থাকে।

—জানো তো—জেলেখা বলে—ঐ আখতার কোচবান আছে না, বলছিল, তোর ছেলে হারিয়ে পাগলী হয়েছিস জেলেখা, আয় তোর পেটে ছেলে দিয়ে দি; ছেলে হলেই তোর মাথা ঠিক হয়ে যাবে। আসল ছেলে হবে তোর, খাসী-বকরী নয়!

আরো কয়েকবার একথা শুনেছে হানিফ, তবু সে চমকে ওঠে—খবরদার ওর কাছে যাবি না, জবাই করে ফেলব তাহলে!

—তা কখনো যাই—জেলেখা অদ্ভুত হাসি হাসে—আমি ততখানি পাগল তো হইনি!

পরক্ষণেই পূর্বপ্রসঙ্গ ভুলে জেলেখা দ্বিধাগ্রস্ত সুরে ভিক্ষে চায়—আমায় চারটে পয়সা দেবে গো?

প্রথমটা হানিফ না শোনার ভান করে। নিত্য দিন কত দেবে সে? পাগলী প্রায়ই আসে, কিছু না নিয়ে বিদায় নেয় না।

—দেবে না চারটে পয়সা ?

অগত্যা হানিফ একটুকরো ছেঁড়া ন্যাকড়ায় হাতের রক্তের দাগ মুছে নিয়ে খুঁটিতে টাঙানো লক্ষ্ণৌকল্লি দেওয়া কোর্তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয়। দলাপাকানো কয়েকটা নোটের অন্তরাল থেকে হাতের আন্দাজে একটা ছোট অঙ্কের মুদ্রা বের করে আলগোছে জেলেখার হাতে ফেলে দেয়।

এবার জেলেখা একান্ত খুশি মনে বিদায় প্রার্থনা করে, বলে—এখন তাহলে যাই ?

—যা।

জেলেখা চলে যাওয়ার উপক্রম করতে হানিফ তাকে ডাক দেয়—এই শোন ?

শব্দের তরঙ্গ বাতাসের বুকে ভেঙে পড়ার আগেই জেলেখা কৃতজ্ঞ-অনুগত চিত্তে ফিরে এসে হানিফের কাছে দাঁড়ায়। হানিফের অতি সন্নিকটে সরে এসে ফিসফিস করে বলে—ডাকলে কেন গো !

—আখতার কোচমানের কাছে যাবি না কোনদিন।

—পেটে ছেলে নিতে তো ? ছেলে আমি আর চাই না।

—সগীরণ বিবির কাছে আর কোনদিন যাসনি তো ?

জেলেখা সবিস্ময়ে উত্তর দেয়—তুমি মানা করেছ তবু যাব ?

—অন্য কোন বেটাছেলে ডাকলে যাবি না।

—যাব না। জেলেখা আনুগত্য দেখায়। প্রতিশ্রুতি দেয়।

সগীরন সম্বন্ধে হানিফ আবার নিষেধাজ্ঞা দেয়—সগীরন এ সব পছন্দ করে না—বাকি কথাটা কিন্তু হানিফের মুখে জড়িয়ে যায়, কোন রকমে সে অংশটাও শেষ করে—জানিস তো ; কতবড় খানদানী ঘরের আওরাৎ সগীরন। তোর ভাগ্যি ভাল যে প্রথমদিন

তোকে রুটি দিয়েছিল। বড় দয়ার শরীর সগীরন বিবির, কিন্তু গোসাও খুব!

আজ শুভদিন। পাঁজির পাতায় শুভদিন কিনা বলা যায় না কিন্তু মনসুরগঞ্জ পল্লীর বারবিলাসিনীদের পক্ষে আজকের দিন বিশেষ আনুষ্ঠানিক।

ভোররাত্তির থেকে তারা বাড়িউলীর সদরের মাথায় মাইক বাজছে। দুপুরের মাঝামাঝি এসেও বিরতি পড়েনি। রঙীন কাগজের ফুল আর শিকলি সদরের গলায় মালার মত ঝুলছে।

দরজার পাশে ওসমান বসে আছে। অথর্ব হয়ে পড়েছে লোকটা। তারা বাড়িউলীর ভূতপূর্ব দালাল। তারা এখন প্রায় স্থবিরা। নতুন মেয়েগুলি তার নামও জানে না, ডাকে নানী বলে। নানীর ঘর থেকে এদের অনেকেই মানুষ হয়ে আলাদা ব্যবসার পত্তন করেছে। তারা বাড়িউলীর বাড়িতে পল্লীর কারোই বিশেষ নিমন্ত্রণ হয় না। যে যার পূর্বাধিকার বলে এখানে প্রবেশ করে।

ওসমান নীরব দৃষ্টি তুলে লছমীর দিকে একবার তাকিয়ে নিলে, তারপর বিনাবাক্যে সদরের চৌকাঠ থেকে পা সরিয়ে নিয়ে তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিল।

—ভাল আছ তো ওসমান? প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার সময় একটা সাধারণ কুশল জিগ্যেস করে নিলে লছমী, তারপর ওসমানের উত্তর প্রতীক্ষা না করেই সটান নানীর দরবারে চলে গেল।

ফাঁকা উঠনে ঢালা সতরঞ্চিতে আসর সাজানো হয়েছে। মাথার ওপর ঠিকেদারবাবুর ত্রিপাল। জিনিসটার বয়েস অনুমান করা কঠিন, কিন্তু স্থান বিশেষের কয়েকটা রিপুকর্ম লছমীকে স্মরণ

করিয়ে দেয়, তার 'বিয়ে'র দিনও এই ত্রিপালটা ঠিক এইভাবে খাটানো হয়েছিল। নাকের সুবৃহৎ ফাঁদি নথটাও লছমীর স্মরণ-পথে উদ্ভাসিত হল। এখন আর লছমী নথ ব্যবহার করে না, তবু সেই ফাঁদিনথটার কথা মনে পড়তে নিজের অজ্ঞাতেই একবার হেসে নিয়ে সে আঙুলের আন্দাজে নাসিকার ছিদ্র অনুসন্ধান করে। কবে যে সেটা বিলুপ্ত হয়েছে তা মনে পড়ল না।

—এস নাতিনী—তারাবাড়িউলী অভ্যর্থনা করলে, অভিমান স্ফুরিত ব্যঙ্গোক্তি করলে সেই সঙ্গে—নাতনী আমার পর হয়ে গেছেন, ডেকে না পাঠালে আসেন না!

—তা বইকি! লছমী কপট ক্রোধ দেখিয়ে বলে—আজই যেন কত নেমনতন্ন করে আনিয়েছ?

লছমীকে দেখে একটি কর্মতৎপরা প্রৌঢ়া ও-দিকের বারান্দা থেকে বলে উঠল—মেয়েরা সব ঐ দিকে, ঐ উত্তুর দিকে। আসরের মাঝখান খালি থাকবে। দক্ষিণে পুরুষরা এসে বসবে।

একটি পরিচিতা মেয়ে লছমীকে ডেকে পাশে বসালে—আয় ভাই লছমী?

নিজের বসবার স্থান সংগ্রহ করার পর লছমী কৌতূহলাক্রান্ত দৃষ্টিতে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে প্রশ্ন করলে—তোমাদের কনে কোথায়?

জবাব দিলে তারাবাড়িউলী—কনেকে সাজানো হচ্ছে, এল বলে।··· হ'ল তোদের? আজকালকার সাজগোজ বুঝি না বাছা, মুখে রং ঘষছে তো ঘষছেই, তাতে কি ব্যাটাছেলের মন ভোলে! স্বাস্থ্যি বলতে তো সব···তা আমাদের এই কনে, যেমন গড়ন-পেটন তেমনি সব। ওলোঙ্গ করে যজ্ঞির জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলে বড় বড় 'মনি'-ঋষিরা মন্তর ভুলে যাবে। আমার 'বিয়ে'র সময় মাসি ওলোঙ্গ

করে দশটা ব্যাটাছেলের সুমুখে ছেড়ে দিল। এ ছুঁতে চায়, ও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে চায়, হু-হু করে 'যোতুক' বেড়ে সাত হাজার! আজকাল নিয়ম পালটে গেছে, সভার মাঝে ওলোঙ্গ হতে মেয়েরা লজ্জায় মরে। বলি ওলোঙ্গ হওয়া সাজের চেয়ে বড় 'অলোঙ্কার' মেয়েদের আছে কি!

লছমী আবার প্রশ্ন করে—নানী আমাদের জামাই কে, কি করে সে?

তারা বাড়িউলী রসিকতা করলে—আমার আর সাধ্যি কতটুকু? তারপর কৃত্রিম খেদের সুরে বললে—জামাই চামার। তোকেও তো এক বিড়িওলার হাতে তুলে দিয়েছিলুম?

ছুটিই মিথ্যে। এ 'জামাই' চামার নয়, শহরের একজন খ্যাতনামা সু-মেকার। আর লছমীর 'জামাই' ছিল ও-পারের গঞ্জ এলাকার এক সুখ্যাত ট্যোবাকো মার্চেন্ট। লছমী নিজের সৌভাগ্যগর্বে 'স্বামী'কে মস্করা করে ডাকত—তামাকবাবু!

আসরের ফরাশ এতক্ষণ শূন্য পড়েছিল। 'কনে'কে সাজিয়ে কোন্ একটা ঘর থেকে নিয়ে আসা হ'ল। সপ্রতিভ মেয়েটি। বছর পনেরো বয়েসের গোলগাল সুপুষ্ট তনুশ্রী। মুখের চাঁদোয়ায় মুচকি হাসির ঝালর ঢুলছে। নাকের ইঞ্চি তিনেক ব্যাসের ফাঁদি নথ ঢুলিয়ে নিমেষে আসরটাকে জরিপ করে নিয়ে কমলি-বিবি তাকিয়া হেলান দিয়ে ফরাশে বসল।

বাড়িউলী নিমেষ নজরে কমলির মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—মুখে একখিলি পানও কি দিতে নেই বাছা? দাঁতগুলো যে মরামানুষের দাঁতের মত কটকট করছে!

কিন্তু জানে কমলি কথা রাখবে না, বলবে—না, পান খেলে আমার

গাল হেজে যায়। অগত্যা সে প্রতিবাদ ওঠবার আগেই ভিন্ন সুরে কথা বলে বাড়িউলী—আজকালকার মে'দের বলিহারি, একটু ভয়ডর নেই গো! আমাদের কালে নথ-ভাঙার দিন আমরা তো কেঁদে ভাসিয়ে দিতুম। তা আজকাল অবিশ্যি সময় বদলেছে, তেমন তেমন বাবু কি আর আছে! সে সব ক্ষীর-মালাই-খাওয়া কেঁদো বাঘের মত ছাপরা মুলুকের জমিদারবাবু। সণ্ডাগুণ্ডা ভোজপুরী দারোগা। তাদের গতর তো দূরের কথা, গোঁফ জোড়াও জাঁহাবাজ! তোরা আর দেখলি কি? দিশি বাবুরা তো সব মিঠেপান খাওয়া মুহুরী, মুখেই যত লম্বাই চওড়াই। দু' কদম হাঁটতে হলেই তাদের মাজায় খিল ধরে যায়। আমরা অমন পঁচিশটেকে একরাতে ঘাল করতে পারতুম—তবে শিক্ষে দরকার।

লছমীর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রমীলা এসেছে, সে প্রশ্ন করে—ও সব কথা যাক নানী, তোমাদের কাল তোমাদের ছিল, আমাদের কাল আমাদের আছে। নতুন জামাই মেয়েকে কি দিচ্ছে বল?

—কি আবার! নানী ঠোঁট উল্টোয়—দেবে আর কি, জুতো সেলাই করে, দেবে এককুঁচি চামড়া। এর বেশি দেবার তার কি ক্ষ্যামতা? এ তো আর সেই চোদ্দ সিকের বাবু নয়!

—চোদ্দ সিকের বাবু, সে আবার কে! প্রমীলার কৌতূহলই বেশি, শোনা গল্প সে আবার শুনতে চায়।

নানীর জবাব ওদিকের বারান্দা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। কর্মতৎপরা প্রৌঢ়া নারীর জবাবের ওপর নিজের জবাবও চাপিয়ে দিলে—জামাই কি দিলে না দিলে জিগ্যেস করিস কেন? তোদের কে কবে কম পেয়েছে! কার জামাই মন্দ এসেছে? আমাদের বাড়ির খেঁদি-বুঁচিরও যেমন জামাই জুটেছে, অন্য কার বাড়ির অপ্সরা কিন্নরীর

তেমনটি হয়েছে ?···তা এতই যদি কুতূহল, তো শোন। আমাদের কমলির বিবির জামাই কি দিচ্ছে, হাজার টাকা নগদ, কানে সোনা, নাকের জড়োয়া, সিল্কের শাড়ি দু'খানা, আটপৌরে—আর কত শুনবি ? বলতে বলতে যে আমার গলায় খিল ধরে গেল। আরো পেত, ঢের পেত, যদি আমাদের কথা শুনতো, তাহলে। বললুম, একবার ন্যাংটো হয়ে দাঁড়া কমলি, চামড়াবালা আর মেওয়াবালায় রেষারেষি লাগিয়ে দি', হু-হু করে দর বাড়বে। তা মেয়ে এমন বেঁকে বসলে যে বোঝায় কার বাপ !

—বয়েস কত জামাইর ? প্রশ্ন করলে লছমী।

—তোদের জামাইর বয়েস যত হয়, ততই তো মঙ্গল ! বেশিদিন তাহলে উৎপাত সইতে হয় না পীরিতে-পড়ার ভয়ও থাকে না। সে সব দিক দিয়ে এ জামাই তো সোনার চাঁদটি ! বয়েস ষাটের ওপর। কিছুদিন হল মাগ সগ্‌গে গেছে। বলতে বলতে হাঁফিয়ে ওঠে কর্মতৎপরা প্রৌঢ়া। দালানের এক পাশে বসে পড়ে গোটাকতক বড় বড় নিশ্বাস ফেলে, তারপর আবার শুরু করে—মাগ সগ্‌গে গেছে, মিনসে বলে আবার বে' করব। সারাদিন মরা চামড়ার গন্দ শুঁখে মন উদাস হয়ে যায়, অন্তত: সন্ধে বেলাটা—। ছেলেরা, বউরা সব 'আপত্ত' করলে। বন্ধু স্বজন বললে—তোমার কি ভীমরতি ধরেছে মহাজন ? কথায় বলে ভাত খেয়ে চান করে জ্বরের তরে, আর বুড়ো বয়সে বে' করে পরের তরে ! তা এখেনে আর পর কে আছে, তুমি ম'লে তোমার হদ্দ-মদ্দ বেটারাই তোমার মাগের 'ইষ্টি সাধন' করবে। শুনে জামাই কানে হাত দিয়ে ছি-ছি করলে, কিন্তু বললে—ভাই, আমি তো একা থাকতে পারব না ? বুড়ো বয়েসে দু'টো পেরাণের কথা বলবার মতন যদি লোক না পাই,

তাহলে যে বুক শুকিয়ে মরে যাব! ইয়ার জবাব দিলে, তার জন্যে চিন্তে কি, তুমি একটা কচি দেখে রেখে নাও। জামাই ফের ছি-ছি করলে—আমার মন্তর হয়ে গেছে, এখন কি আর এঁটোকাঁটা চলে! এঁটোকাঁটা কেন, বন্ধুরাই সলা দিলে, তুমি একটা কচি লক্ষ্মামন্ত মেয়ের নথ ভেঙে তাকে নিয়ে ঘর কর। ধম্মো বাঁচবে, পেরাণ বাঁচবে।

কলাবতী চুটলা, বলে বসল—তোমাদের কমলি বিবি বুঝি আসল কুমারী। বুক মাজার গড়ন দেখে তো মনে হয় না?

উত্তর দিতে গিয়ে প্রৌঢ়া ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—এ কথা সুধোস কেন? নথ-ভাঙার আগে তুই নিজে কি ছিলি? আর সত্যিকার অ-ভাঙা কুমারী মে'দের ছুম্বো-ছুম্বো জামাইর হাতে তুলে দিয়ে শেষকালে থানা পুলিশ ডাক্তার বদ্যি সিবুলসার্জেন করে মরি আরকি!

তিক্ত প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রমীলা আবার বললে—ও নানী, তোমার সেই চোদ্দ সিকের বাবুর গল্পটা বললে না?

—ও হাঁ—নানীর মনে পড়ে গেল। ফোকলা মুখে মুচকি হেসে সামনের পিকদানে ছ্যাঁচা পানের মুখভর্তি পিক ফেলে বললে—শুনবি তাহলে?

—বা, শুনবো না!

নানী আরম্ভ করলে—তখন আমরা সবে কাজ শিখছি, সেই তখনকার শোনা! আমাদের বাড়িউলী কত ভালবাসত, কত গল্প শেখাত। কত শিক্ষে দিত। কথায় বলে, চোষট্টি বিদ্যে না শিখলে "বেশ্যে" হওয়া যায় না। ভাতারের সঙ্গে শোয়া ছাড়া যে আর কিছু জানে না, তাদের বলে সতীনক্ষী। এমনি সতীনক্ষী আছে বলেই ভদ্দরলোকরা বেশ্যেবাড়ির মাটি কামড়ে পড়ে থাকে।....

আমাদের কত রঙ্গ রসিকতা শিখতে হ'ত। এ সব না জানলে তখনকার দিনে রূপ যৌবন যতই থাকুক না কেন, 'পাকা' বাবুদের কিছুতেই বেঁধে রাখা যেত না। অবিশ্যি হপ্তাবাবুদের কথা আলাদা। পাকাবাবু গা ছুঁতেন কালে ভদ্রে, পাঁজি পুঁথি দেখে। প্রায় দিন তো শুধু গল্প-সল্প আর একটু-আধটু নেশা-টেশা করেই ঘরে ফিরতেন। তা যা বলছিলুম—সন্ধের সময় এক মে'মানুষ খদ্দের ধরবার জন্মে রাস্তার গ্যাসের আলো বাঁচিয়ে, অন্ধকার গলির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। খদ্দের এল, দর জিগ্যেস করলে। তার গলার আওয়াজেই মে'মানুষটা টের পেলে, এ বড় ঠ্যাটা মনিষ্যি! তার গ্রাহক পছন্দ হল না। তখনকার দিনে খদ্দের তো আক্রা ছিল না। পালপর্বে দরজায় লাইন দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে যেত। কত যুবো, কত বুড়ো! আমার ঘরেই কত সাহেব-সুবো, গোরা-পল্টন বসে গেছে। তারা টাকা দিত বটে, যত নিতে পার!

নানী আবার আসল গল্পের খেই ধরে—মে'মানুষটার খদ্দের পছন্দ হল না। দর জিগ্যেস করতে জবাব দিলে—আমার ঘরে যদি আস বাবু, তবে আট আনা; আমার মেয়ের ঘরে যদি যাও বাবা, তাহলে এক টাকা, আর আমার নাতনীর ঘরে যদি যেতে চাও ভাই, তো তু' টাকা। জবাব শুনে লোকটা ভড়কে গেল—বাবাঃ, মাগীর বয়েস কত! কিন্তু সে-ও তো ঠ্যাটা লোক, গম্ভীর মুখে উত্তর দিলে—ও তোমরা তিন পুরুষ আছ? তা ভালই, কিন্তু আমার হাতে তো আজ সময় নেই; কাল পুরো চোদ্দ সিকে এনে তিনজনের সঙ্গেই দেখা করে যাব।

অবশেষে নানী সখেদে বললে—সে দিন আর নেইরে নাতনী, সে দিন আর নেই! আজকাল মানুষের মধ্যে শুধু জন্তুটাই আছে,

মনিষ্যিটা নেই। খিদে মিটলেই পালা শেষ। আজকাল কি রস আছে, না রসের নাগর আছে? তো সব উটকো খদ্দের। শহরে গঙ্গা নাইতে এল, কি হাসপাতালে বউ "প্রেসব" করাতে এল, তার মাঝে এক ফাঁকে এ'বাজারেও ঘুরে গেল। আমাদের কালে যে এ'সব না ছিল তা নয়, কিন্তু বেশির ভাগই নাগর। নাগর কে হয় জানিস?

ক্ষণেকের বিরতি দিয়ে নানী আবার পানের পিক্ ফেলে, তারপর ছড়া কাটে—

এ কূল ভাঙে, ও কূল ভাঙে,
তাকে বলে সাগর—
আর মাকে ভজে, মেয়েকে ভজে,
তাকেই বলে নাগর।

তারা হল জাত বাবু, যেমন জাত সাপ। তা নইলে কি আর সুখ আছে রে? ঢোঁড়া হেলে কি খেলতে জানে? খেলতে খেলে জাতসাপ। ভজতে যদি হয়, ভজবি জাতবাবু, তার সোয়াদই আলাদা। খানা ডোবার খলসে পুঁটি নয়রে, যেন পদ্মানদীর ইলিশ!

প্রতিমার গায়ের ঘামতেলের মত হাল্কা মেঘমাখানো শরতের আকাশএর মধ্যেই ঝলসে উঠেছে। নিয়মমত আজও শের অতি প্রত্যূষে লছমীর কাছে এসেছিল। তারপর গালগল্প হাসিমস্করা আর মান-অভিমানের পর্দায় বিভিন্ন সুর বাজতে বাজতে শেষ পর্দায় পোঁছে গেছে। বেলা বেড়ে গেছে অনেক।

—দেখছিস! শের কথা বন্ধ করে ঘরের বাইরে মাটির উঠনের

মাথায় যতটুকু আকাশ দেখা যায়, সেদিকে লছমীর দৃষ্টি টানবার চেষ্টা করে।

—কি? লছমী আকাশের দিকে তাকায়। হয়তো কোন নতুন ধরনের পাখি, যা শেরের শিশুদৃষ্টিকে প্রায়ই বিস্ময়চকিত করে। উড়ন্ত পাখির পালক দেখেও শের তার জাত নির্ণয় করে। দেশী অথবা বিলায়তী। পরিচিত পাখিটা দেশী। আর অচেনা সব পাখিই বিলায়তী। দেশী পাখির গুণাগুণ সম্বন্ধে শের লছমীর কাছে তথ্যপূর্ণ বিবৃতি দেয়। বিলায়তী পাখির কথাও সে বেশ স্বচ্ছন্দে বলে যায়, শুধু নামটাই বলতে পারে না। লছমী কৌতুকায়ত চোখে তাকিয়ে থাকে। আর মিটিমিটি হাসে!

শের তখনো আকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বসে আছে। কিন্তু নীল আকাশে ডানা মেলে দেওয়া একটা শঙ্খচিল ভিন্ন লছমীর নজরে আর কিছু পড়ে না। অবশ্য তালচড়ুই দু-একটা উড়ছে। সেদিকে তাকিয়ে লছমী বললে—ও তো শঙ্খচিল! আর তো কিছু নেই?

—নেই কি—লছমীর বিস্ময়ের ওপর শের নিজের বিস্মিত কণ্ঠস্বরের ছাপ এঁকে দিয়ে বলে—যখন তোর ঘরে ঢুকলুম, দেখি চাক্কা (সূর্য) নাজুক লড়কীর আরীজের (গাল) মত লাল টুকটুক করছে, আর এখন বিলায়তী কুত্তার চামড়ার মত ঝক্ঝক করছে —তাকিয়ে দেখা যায় না!

উপমা শুনে লছমীর হাসা উচিত ছিল, কিন্তু কত আর হাসবে? শেরের সব কথায় হাসতে গেলে সে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে যে! লছমী স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিলে—সত্যি, কথায়-কথায় একটু দেরি হয়ে গেল, না?

—একটু দেরি? শের বিরক্তির ধনুকে টঙ্কার দিয়ে উঠল—হাসি দিল্লগীতেই টাইম চলে গেল, আমার সব কাজ বাকি পড়ে আছে। গোসল করব কখন?

—সব আমার দোষ, না? লছমীর অভিমান হয়।

—তোর কসুর কেন—শের কোমল সুরে বলে—সব আমার মুহব্বতের দোষ। এ দুনিয়ায় সবসে বড়া গুনহা, মুহব্বৎ। ইনশান সব ভুলে যায়।

অতঃপর শের সত্যসত্যই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এখনো তার গোসল হয়নি। শেরের স্নানপর্ব এক বিচিত্রানুষ্ঠান। দর্শনযোগ্য বস্তু। সরকারী জলের কল প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে ভেঙে পড়ে। কিন্তু সেজন্য শেরের তিলমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। ওটা গিরগিটের ভিড়। নোংরা জঘন্য ভীরু কাপুরুষ ঈর্ষাপরায়ণ নারী পুরুষের সমাবেশ। ওদের নিয়ে মাথা ঘামায় না শের। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির একটা নিয়ম আছে। বেলা ন'টা নাগাৎ বিলায়তী কুকুরের লেজের মত জলের মোটা ধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে বেলা সাড়ে ন'টায় সেটি টিকটিকির ঝিরঝিরে লেজে পরিণত হয়। তারপর কার অদৃশ্য পায়ের চাপে তা টুক্ করে খসে যায়। গন্নুর পানের দোকানে শের এই সময়টা ঘড়ি দেখেছে—সাড়ে ন'টা। কলের জল যাওয়া দেখে কতদিন গন্নু ঘড়ি মিলিয়েছে।

—তেল—

লছমী ত্বরিত হাতে দুটি কাঁচের বাটি এনে শেরের সমুখে রাখে। একটিতে সরষের তেল। অপর বাটি কোন সুরভিত কেশতৈলের। চামেলী অথবা গুলরোগন।

পরিষ্কার একটা তোয়ালে, মাদ্রাজী লুঙ্গি, নকল সিল্কের গোলাপী

গেঞ্জি বের করে দেয় লছমী। শের শৌখিন। বিলাসী। এ বিষয় সামান্য গাফিলতি তার অসহ্য। যদিও শেরের আহার বা বাসস্থানের নির্দিষ্ট কোন জায়গা নেই, যদিও সে বলে—আমার তো হারামের খাওয়া আর খয়রাৎ-এর শোয়া নিয়ে দিন চলে; তবু সে নিজের আরাম বিলাস সম্বন্ধে অধিক মাত্রায় সচেতন। কতদিন সর্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন নিয়ে, ফাটাচেরা কাঠের গুঁড়ির মত চৌচির হয়ে ফিরেছে এবং সে আঘাতের বেদনা হাসিমুখে সহ্য করেছে, কিন্তু দেহের ওপর সামান্য মাছির উপদ্রবও সে সহ্য করতে পারে না।

লছমী একটা পিতলের সাজিতে শেরের স্নানের সরঞ্জাম গুছিয়ে দেয়—যেন মহাবীরজীর পূজোর থালা সাজিয়েছে সে!

শের ব্যস্ত গম্ভীর স্বরে বলে—তোর সব কাজেই দেরি হয়! এ সব কাজ আগে থেকে করে রাখতে পারিস না?

—ওঃ, হুকুম করে দেখ না! আমি কি তোর সাদি-করা বিবি, না মাইনে-করা বাঁদী?

—ক্যা!

—কি আবার! লছমী চটুল মুখভঙ্গি করে।

—আমার দেরি হয়ে যায় না?

—হলেই বা, তোর সঙ্গে কি আমার ঠিকের সম্বন্ধ?

লছমীর চটুল প্রতিবাদ কাঁচা সিদ্ধির নেশার মত শেরকে নিমেষে আচ্ছন্ন করে। সে ত্বরিতে লছমীর কাছে সরে এসে প্রায়-বিগলিত স্বরে বলে—আমার রূপ দেখে নেশা জাগে না, কিন্তু তোর এই মুখখানাতে কি যেন আছে!

—কি আছে? কর্মব্যস্ত লছমী মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে তাকায়।

—কি যেন আছে!

—কি ?

শের বলে বটে কিন্তু খুঁজে পায় না বা ব্যাখ্যা করার মত ভাষা পায় না সে। আবিষ্কারের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে সে বলে—কিছুই তো নেই! বোঁচা নাক, ক্ষুদে চোখ, পোড়া গায়ের কালো রং, কটা চুল, কালচে ঠোঁট—কিন্তু তোর সঙ্গে কথা বলতে বসলে ঘড়ির কাঁটা কখন যে ঘুরে যায়, তা বুঝতে পারি না। মনে হয় এ'ভাবে জিন্দগীর ঘড়িতেও কখন বারোটা বেজে যাবে, টের পাব না।

শের আজ যেন লছমীকে নতুন করে আবিষ্কার করছে, সেই আনন্দে মশগুল হয়ে বলে যায়—আমার মত সাচ্চা ফকির না হলে কেউ তোদের মত আওরাৎ-এর দিল-তুনিয়ার খবর পায় না লছমী। তোর ঐ কুত্তা-চাটা বাসি মড়ার মত কালো চামড়ার আড়ালে যে আশমানী মোতির রং আছে, তা তোর হাজার হাজার মেহমানের একজনও টের পায় না।

কথার আবেগে শের কখন ঘরের মেঝেয় বসে পড়েছিল, তোয়ালে লুঙ্গি আর রঙীন গেঞ্জিটা কাঁধের ওপর ফেলে, বাঁ হাতে তেল সাবান আর দাঁতের মাজনের টুকিটাকি ভরা সাজিটা নিয়ে সে আবার উঠে দাঁড়াল। তারপর লছমীর দিকে একবার নীরবে তাকিয়ে কক্ষ ত্যাগের চেষ্টা করল।

হঠাৎ কি যেন হ'ল লছমীর, দরজার কাছে এসে সে শেরের পথ আগলায়—আর একটু থাক না, হাতের জিনিস সব নামিয়ে রাখ ?

—কিঁউ বে!

ত্নটি চোখে তন্দ্রার পর্দা ঝুলিয়ে লছমী হাই তোলে। চোখ তুটিতে তুষ্ট আবেশের ঘোর আর মুখে নিঃশব্দ হাসি নিয়ে মোহবিজড়িত মৃত্নু স্বরে বলে—বড় ঘুম পাচ্ছে। চোখ ভেঙে পড়ছে যেন!

—ও তোর নিন্দ নয়, লছমী, সোহাগ রাতের স্বপ্ন। শের লছমীর প্রায়-নগ্ন কাঁধে হাত রাখে, তারপর অন্য হাতে স্খলিত আঁচলটা যথাস্থানে তুলে দিয়ে বলে—এ খোয়াব দিনের বেলায় দেখতে নেই। এর পর কি মনে করে সে দুটি আঙুলের চাপে লছমীর গালে সজোরে চিমটি কেটে বলে—চুড়েল কঁহিকী রাস্তা ছাড় ?
গালের জ্বালা থুথু ঘষে নিবারণের চেষ্টা করতেই লছমীর হস্ত-বিস্তৃত-করা দরজার আগল খসে পড়ল। সেই অবসরে শের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কি একটা মন্তব্য করে লছমী সেটা তার কানে যায় না।

কয়লা ধুয়ে অবশ্য ময়লা ছাড়ানো যায় না, কিন্তু শের লক্ষ্য করে দেখছে নিয়মিত যত্ন আর মার্জনার গুণে কালো লোহার কড়াই আয়নার মত ঝক্ঝকে হয়ে ওঠে। ময়রার দোকানের দুধ-জ্বালের কড়ার পিঠে আয়নায় দেখার মত মুখ দেখা যায়।
সুমুখে এই সত্যকার দৃষ্টান্ত থাকতে শের কেন বাহাদুরের লোমে কৃষ্ণতার কলঙ্ক পোষণ করবে ? অবশ্য বছর-দুই আগে শীতের সময় দেশী সরাবের ভাঁটি সংলগ্ন তেলেভাজার দোকানের উনানের পাশ থেকে নেহাৎ দয়াপরবশ হয়ে লোমপোড়া ছাইমাখা কুকুরছানাটাকে তুলে আনবার সময় এ কথা তার মনে হয়নি। আশ্রিতের মত কুণ্ঠিত অবস্থায় মাস কয়েক কাটিয়ে বাহাদুর যখন আত্মীয়ের দাবি ব্যক্ত করতে আরম্ভ করেছে, তখনি কথাটা শেরের মনে জেগেছে।
ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে লছমী একদিন বলেছিল—
—আগে দেখলুম কুকুরছানাটাকে পা দিয়ে নাড়ছিস, আর আজকাল দেখি তার মুখে চুমু দিতেও তোর বাধে না।

লছমীর কথায় শের একটু লজ্জিত হয়েছিল, কিন্তু স্বকর্মে বিরতি না দিয়ে জবাব দিয়েছিল—তোর চুমায় আজকাল তেমন 'ঠেস্' পাই না, তাই—

উহু কথাগুলির ফাঁকে শের পুনরায় বাহাদুরের মুখচুম্বনের কাজটি সেরে নেয়।

—তা 'টেস্' কেন পাবি! লছমীর নীলারক্তিম মুখে আর কোন উত্তর আসেনি।

কিন্তু সে'দিন পর্যন্ত শের স্থিরসঙ্কল্প হতে পারেনি। উকিল বাবুর বাড়ির বারান্দায় শেকল বাঁধা একটা সাদা বিলায়তী কুত্তা দেখার পর থেকে সে বহুবার ভেবেছে, বাহাদুরকে বিদায় করে দিয়ে একটা বিলায়তী কুত্তা পোষে।

ইচ্ছেটা লছমীর কাছে ব্যক্ত করাতে সে কিন্তু আপত্তি জানিয়েছে—সে কি রে; পরের ভাল জিনিস দেখে নিজেরটা ফেলে দিবি! তবে তো তুই অন্য লোকের বউ দেখে আমায় তাড়িয়ে দিতে পারিস?

—আমিই কি বাহাদুরকে তাড়িয়ে দিতে চাই, কিন্তু এ উল্লুকা পাট্টার বোলি ভাল নয়! কেঁউ কেঁউ করে। তাছাড়া তুই যা বলছিলি—তোকে তো আর আমি পুষিনি, তুই আপসে আপ আমার বিবি সেজে বসে আছিস। ঐ যে বলে না, মান না মান, ম্যায় তেরা মেহমান! মানলি তো মানলি, না মানলি তো আমার বয়েই গেল, কিন্তু আমি তোর কুটুম, তোর মানী অতিথি—তোর হয়েছে ঠিক তাই।

লছমী রেগে যায়—আমার সঙ্গে তুই রাস্তার কুকুরের তুলনা করলি!

—আমি কখন কি বললুম, তুই-ই তো বক্‌বক্ করছিস? যাক এ সব ফালতু বাৎ, কিন্তু এ শালা কুত্তার বোলি মোটেই ভাল নয়।

আমি এটাকে "মাইনাস" করে দেব।...যা শালা "ডগ" ভাগ যঁহাসে—আমি বলছি ভাগ, ওয়ান, টু, থ্রি—

শের বাহাদুরক পদাঘাত করে। বাহাদুর ছিটকে পড়ে যায় আর কেমন যেন কঁকিয়ে ওঠে।

লছমী-ছি-ছি করে—ছি ছি-ছি, তুই কি রে! শের হয়ে তুই বাহাদুরের অপমান করিস? তুই নিজেই না এর নাম রেখেছিস, বাহাদুর?

—হাঁ, বাহাদুর না খানবাহাদুর—শের ব্যঙ্গোক্তি করে। লজ্জিতও হয় সে, কিন্তু জিদ ছাড়তে চায় না—লেকিন শালার বোলি যে মোটেই ভাল নয়; দেখলি না, লাথ খেয়ে কেমন কেঁদে উঠল?

লছমী ভরসা দেয়—এত সহজে আশা ছাড়লে কি চলে? তোর শুধু এক কথা, বোলি ভাল নয়! শিখিয়ে নিলে দেশী কুত্তাও আংরেজী বোলি বলে। কিঞ্চিৎ নীরব থেকে লছমী আবার বলে—তুই দিনকে দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিস! কথায় কথায় নিরীহ জীবটাকে মারধোর করিস? কথার শেষে লছমী সবিস্ময়ে শেরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিস্ময়ের সঙ্গে যেন খানিকটা প্রশ্নও আছে তার চোখের দৃষ্টিতে।

লছমীর বিস্ময় যে বক্তব্যটি পরিষ্কার করতে পারেনি, তা কিন্তু শের লছমীর নীরব ভঙ্গি থেকেই বুঝতে পারে। বুঝতে পেরে সে লজ্জায় মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়েছিল। শের বুঝেছিল, লছমী বলতে চায়, ভালবেসে যে বঞ্চিত করে, ইজ্জৎ দিয়ে কেড়ে নেয়, তার মত অপদার্থ বিবেকবিহীন শয়তান দুনিয়ায় দ্বিতীয় নেই। কিন্তু শের জানে, বাস্তবিকই সে শয়তান নয়। মানুষ। গিরগিট-মার্কা নকল মানুষ নয়। আসল মর্দ।

ফাঁড়ির পালোয়ান রামবচন সিং। বীরের যথোচিত সম্মান দিতে জানে রামবচন সিং। শের প্রতিদিন প্রত্যূষে ফাঁড়ির আখড়ায় কুস্তি লড়তে যায়। রামবচন সিং তাকে অভিবাদন জানায়—সেলাম ওস্তাদ। শের পাকা ওস্তাদের মত একবার বাঁ দিকে, একবার ডানদিকে তার বিশমনী রদ্দা-সওয়া গণ্ডারের মত শক্ত ঘাড় হেলিয়ে সেলাম ফিরিয়ে দেয়। প্রতিনমস্কার জানায় রামবচন সিংকে। বলে—খরিয়ৎ হ্যায় ন চেলা?

—জি হাঁ—

শের চেলার কাঁধে সাদর চপেটাঘাত করে বলে—খুশ রহো—

তারপর চিৎ-পটের খেলায় কখনো শের কখনো তার চেলা রামবচন সিং পরাজিত হয়। আখড়া ছেড়ে আসবার সময় শের রামবচন সিং-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আসে। বাইরে কোথাও দঙ্গল লড়তে গেলে রামবচন সিং শেরের আশীর্বাদ নিয়ে যায়।

আবার এই রামবচন সিং মহল্লার হল্লা-হিড়িকে গুণ্ডা শেরকে হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে যায়। শেরকে একশ' সাত সতেরোয় চালান দেয়। আদালতে পেশ করে। শের রামবচন সিং মারফৎ দু-দুবার খুনের মামলার আসামী হয়ে চালান গেছে। তাকে হাজতে নিয়ে যাওয়ার পথে অথবা হাকিমের সামনে হাজির করানোর সময় কোনদিন সে রামবচন সিংকে বাধা দেয়নি। বাদানুবাদ করেনি! রামবচন সিং বহুবার কর্তব্যের খাতিরে শেরের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে কিন্তু কোনদিন ভুল করেও দুর্ব্যবহার করেনি। তাই রামবচন সিং চেলা হলেও শের তাকে মনে মনে সেলাম জানায়। আদব-কায়দায় নিজের গুরু মনে করে।

বাহাদুরের বিদায়-প্রসঙ্গ বছর দুই আগে চাপা পড়ে গেছে। দুটো শীতে গোস্ত রোটি খেয়ে বাহাদুর এখন মনসুরগঞ্জপল্লীর হেড কুত্তা। শের তাকে আদর করে ডাকে রিং মাস্টার। আমরিকান টাইগার! শিখিয়ে দেওয়ার ফলে রিং মাস্টারের আংরেজী বোলি সিকি মাইল দূর থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। অন্ততঃ শের তা শুনতে পায়।

লছমীর বাসনা ছিল বাহাদুর সার্কাসও শেখে, কিন্তু সে কথা শুনে শের হেসে উঠেছিল—দ্যুৎ, এ কি, লেডি, যে হাতে ছাতা নিয়ে রোপ-টিরিক দেখাবে! লছমীর কথা শের ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়।

বিলায়তী কুত্তা পোষার অনুমতি পায়নি শের। অগত্যা সে বাহাদুরকে প্রত্যহ ঘণ্টাখানেক ধরে বিলায়তী সাবান মাখিয়ে দুধ-আণ্ডার সরবৎ খাইয়ে রীতিমত শ্রী ও শক্তিসম্পন্ন আংরেজী পড়া বাবুর মত গড়ে তোলবার চেষ্টা করে। লঙ্কামার্কা আংরেজী বাবু নয়। লঙ্কাবাবুদের ঝোলানো কোঁচার মত বাহাদুরের লেজের অবান্তর অংশটাও শের ঘোড়া-হাসপাতালের পাশকরা ডাক্তারকে আট টাকা ফী দিয়ে কাটিয়ে নিয়েছে। পাড়ার নাপিত আট আনায় রাজী ছিল, কিন্তু ও-সব দেশী কারবার শেরের মনঃপূত হয়নি।

শের লছমীকে কাছে ডেকে বসায়। তারপর কয়েকটা অবান্তর প্রশ্নে কুশলাদি জিগ্যেস করার পর কিঞ্চিৎ খোশামুদে স্বরে বলে—দেখ বিবি—

—সবই তো দেখছি, আর কি দেখাবি?

—তুই তো দেখেও মানতে চাইবি না?

অর্থাৎ লছমীকে মানতেই হবে, অন্যথায় শের চরম অভিমানে ভেঙে পড়বে।

শেরের ভণিতা দেখে লছমী একপাশে মুখ লুকিয়ে ঠোঁটের কানা

থেকে নিঃশব্দে খানিকটা হাসি উগলে দেয়, তারপর নির্লিপ্ত. সুরে জবাব দেয়--তুই যেন আমার মনের বাসায় ঢুকে বসে আছিস! কি বলতে চাইছিস তাই বল্ না?

—তোর মনে কোন বাসা থাকলে তো কথাই ছিল না, মন তো তোর যেন টিশনের ওয়েটিং রুম! আমার আর তোর মনের আশমান জমিনের ফরাক। শের সখেদে বলে যায়—আমি আশমানে তাকিয়ে সূরয দেখে বলি কি গরম! আর তুই আশমানে না তাকিয়ে জলের ওপর সূরযের ছায়া দেখে বলিস, উঃ, কি ঠাণ্ডা!

—তুই খুব কথা জানিস বাপু—লছমী কপট বিরক্তির সঙ্গে বলে—শুনেছি যার বাত চলে তার হাতের ছুরি চলে না, তোর তো দুটোই সমান তেজে চলে!···কি জিগ্যেস করবি, সোজা কথায় বল, এত ভণিতা কিসের?

—তা বটে, বাউণ্ডারী দিতে দিতে আমার আবাদী জমি ইঁট-সুরকিতে ভরে যায়!

—আবার—!

ধমক খেয়ে শের খানিকক্ষণের জন্যে চুপ করে যায়, তারপর ভীতিপূর্ণ মৃদু মন্থর সুরে বলে—বিবি, বাহাদুরের সুরৎ খুলেছে, না? যেন শেরকা বাচ্চা!

লছমী নাক সিঁটকে বাহাদুরকে নিরীক্ষণ করে ছোট জবাব দেয়—হ্যাৎ! শের লছমীর বাহুতে মিনতির ছাপ দেয়—অমন চোখ কুঁচকে কেন, চোখ চেয়ে দেখ না?

—কি আর দেখব—লছমী বাহাদুরের ওপর থেকে দৃষ্টি তুলে সে দৃষ্টি শেরের মুখে স্থাপন করে। পূর্ণায়ত পরিপূর্ণ দৃষ্টি।

—উত্তর দিলি না তো?

—তোর সুরৎ যার চোখে ধরেছে সে আর অন্য জানোয়ার দেখে কি করবে ?

—আমি জানোয়ার ?

—তোর নামটা তো সেই রকমই ?

—ওটা ঠিক নাম নয়, আমার তারিফ। শের কিঞ্চিৎ বিনম্র সুরে বলে—গন্নু নাম দিয়েছে শের খাঁ। অনেক কিতাব পড়েছে সে। …নারে না, দেশী মাদ্রাশায় নয়, আংরেজী ইস্কুল থেকে মিডিল পাশ করেছে। গোরমেন্টের জিলা ইস্কুল। আংরেজ হেডমাস্টার ছিল সে টাইমে।…আমার ওয়ালিতের দেওয়া নাম ঈসরাইল খাঁ। আমি পাঠান।

—ওঃ বাবা! লছমী কপট বিস্ময়ে ছু'টি চোখ বিস্ফারিত করে বলে—ঈসরাইল খাঁ, শের খাঁ—আরো কত কি! সেই যে বলে না—

কুট্টা চুলগা বাবারচীখান,
কট্টা কপড়া তস্তরদান ;
এক-এক মিঞাকা দশ-দশ নাম,
ফজলে, ফজলু, ফজলরাম !

তারপর লছমী হাসতে হাসতে শেরের গায়ে ঢলে পড়ে—বাপরে বাপ, নকল শেরের এত দাপট ?

—আমার দাপটের কি দেখলি তুই—শের লছমীকে নিজের অরণ্যদেহের বিপদসংকুলতায় টেনে নিয়ে পেষণ করে। তার অস্থিপঞ্জর মেদমাংস যেন সেই বন্য নিপীড়নে দানাবাঁধা মৃত্যুর মত জমাট হয়ে ওঠে।

লছমী রুদ্ধশ্বাস, তবু অতিকষ্টে গলা থেকে শব্দ বের করে সে—এই কি

তোর কম দাপট নাকি, জঙ্গলের শের কামড়ে খায়, আর তুই যেন আমায় চটকে খাচ্ছিস !

—বল, আর বলবি জানোয়ার ?

পুলকাবিষ্ট লছমী বাইরে বিরক্তি দেখিয়ে বলে—অতশত জানি না বাপু, কিন্তু অন্ধকারে তোকে ভালুকের মত মনে হয় !

শের তখন যেন জোঁকের মত লছমীর গণ্ডের রক্ত পান করছিল, তার গাল থেকে মুখ তুলে নিয়ে নিজের লালাসিক্ত ঠোঁট দুটি চেটে পরিষ্কার করে নিয়ে বললে—আমি তো বাঘ ভালুক, আর যারা রাতের অন্ধকারে চাদরে মুখ মুড়ে তোর কাছে আসে, তাদের দেখে বুঝি মনে হয় বেহেস্তের মুসাফির পেয়ারের পয়গম শোনাতে এল ?

শেরের কথা সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লছমী নিজেকে তার আয়ত্ত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কিছুটা দূরে সরে গেল। তীব্র দৃষ্টিতে শেরের দিকে তাকিয়ে সে বললে—তুই বড় হিংসুক শের। তোর মন বড় নিচ্ !

—হিংসুক, নীচ ! নতুন বিশেষণ প্রযুক্ত হতে শের স্তম্ভিত হয়ে গেল। কোনক্রমে ব্যথিত বিস্ময় নিয়ে সে উচ্চারণ করলে—হিংসুক, নীচ ! আমি হিংসুক, আমি নীচ ?

—হাঁ—লছমী পুনরুক্তি করে—তুই এইসব নামে মানুষ আর আসলে পশুগুলোকে পর্যন্ত হিংসে করিস ? লছমীর দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণ হয়।

লছমীর কথা শের কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না, ইতিমধ্যে সে নিজের মনের গুপ্ত কোণগুলি তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করে দেখে নিয়েছে। সব আছে সেখানে। অদম্য কামনা, দুর্নিবার ক্রোধ, অসীম মোহ, বিপুল বৈরাগ্য···সব আছে। কিন্তু হিংসে নেই।

শের পরুষ কণ্ঠে প্রতিবাদ করে—আমি ঐ পশুগুলোকে, ঐ গাধার বাচ্চাগুলোকে হিংসে করি? নঁহী, বিলকুল নঁহী—

—হাঁ করিস—লছমীর খুরদৃষ্টির সঙ্গে কণ্ঠস্বরও বে-আব্রু হয়ে পড়ে—কেন তার এত হিংসে জানিস, ওরা তোর মতনই মানুষ। তাই তুমি ওদের হিংসে করিস—ওরা যে তোর দুশমন! তোর মুহব্বতের ভাগীদার।

লছমী আর কিছু বলে না, কেবল দূর থেকে উত্তপ্ত দৃষ্টির শিখায় লেহন করে। শেরের ভেতরটা পর্যন্ত ঝলসে যায়। হয়তো বা আলোকিতও হয় সেই সঙ্গে। তার হঠাৎ মনে হয়, গিরগিট আর আর জোঁকগুলোকে সে মানুষ মনে করুক বা না করুক, তাদের সম্বন্ধে একটু ঈর্ষাবোধ তার অবশ্যই আছে। অস্বীকার করবার উপায় নেই—অবশ্যই আছে। কিন্তু এ তার এক নতুন রোগের উপসর্গ। কোথা থেকে এল এ রোগ! কোথা থেকে ঈর্ষার বীজানু এসে তার চারসাম-নামাজ-পড়া পবিত্র হৃদয়ে বাসা বেঁধেছে!

লছমীর চোখের ওপর চোখ রাখে শের। লছমীর মুহব্বৎই এই সর্বনাশ করেছে। পৌরুষ নাশ করেছে তার। মনুষত্বকে পিষে দিয়েছে।

কিছুমাত্র বাহ্যিক আড়ম্বর না দেখিয়ে শের লছমীর কাছে সরে আসে। তারপর একান্ত আচম্বিতে লছমীর যে গালটি সে এতক্ষণ রক্তপায়ী বন্যপশুর মত লেহন করছিল, সেই গালে একটি পরিপূর্ণ ওজনের চপেটাঘাত করে বলে—তোর কথাই ঠিক, এ আমার হিংসে! আওরাতের মুহব্বৎ গন্ধা ডিরেনের পানি, এক ফোঁটা পেটে গেলে হাজার বিমারীতে মন ভরে যায়।·· হট যা তু মেরে সামনে সে—তু আওরাৎ নঁহী, নাগীন হ্যায়!

বলতে বলতে শের কেঁদে ফেলে। লছমী অবাক-বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। শেরের চপেটাঘাত তাকে আহত করেছে, কিন্তু এ নিপীড়নে সে বিস্মিত হয়নি। শেরের অশ্রুবর্ষণে সে আহত-বিস্ময় নিয়ে শূন্যের দিকে দৃষ্টি তুলে ধরে। শেরই একদিন তাকে অভয় দিতে গিয়ে বলেছিল, আকাশের বাজ চোখের জলের মতই নরম। যত কঠিন বস্তুই হোক, ঠিক জায়গায় ঘা পড়লে কান্নার মত গলে যায়। আগুনকে আটকে রাখলে সে-ও জলে পরিণত হয়।

সেদিন কাছাকাছি কোন জায়গায় বাজ পড়ার শব্দে লছমী কেঁপে উঠেছিল। শের তাকে নিজের বুকের নিরাপদ আশ্রয়ে টেনে নিয়ে বলেছিল—দূর বোকা, বাজের শব্দে ভয় পাস কেন! ও তো পানি। শুধু পানি। আল্লার আঁশু আগুন হয়ে আশমান থেকে ঝরছে, কিন্তু তা পানি-ই। এতে ভয়ের কি আছে?

শের কাঁদতে কাঁদতে বলে—আমার মনে হিংসে এসে গেছে, ম্যায় আব ইনশান কহলানেকা কাবিল নহী রহা। আর তুই আমায় মানুষ বলে ডাকিস না। মানুষ নামের যোগ্য নই আমি। আমিও একটা গিরগিট!

লছমী অদূরে আহত-তন্ময়তা নিয়ে বসে আছে। কিন্তু শেরের দৃষ্টির সামনে থেকে তার উপস্থিতি সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ইঙ্গিতে বাহাদুরকে কাছে ডেকে তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে শের স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। অনেকক্ষণ বসে রইল। অনেকক্ষণ বসে রইল সে। ইতিমধ্যে লছমী কখন ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেছে।

লছমী বাইরের উঠনে এসে দাঁড়াল। অল্প সময়ের ব্যবধানে ঘটে যাওয়া দু-টি ঘটনার মধ্যে যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পায়নি। কিছুক্ষণ আগেই শেরের রোমশ বুকের গহন অরণ্যে হারিয়ে গিয়েছিল সে।

সর্বসত্তা নিয়ে ডুবে গিয়েছিল। আর শের ঘেমে নেয়ে গিয়েছিল। সেই স্রোতে পূর্ণাবগাহন করেছে লছমী। মনে হয়েছে গতরাতের, শুধু গতরাতের কেন, তার পতিতাজীবনের সমস্ত রাতগুলির সব পাপ, দৈহিক আবিলতার যত চিহ্ন, সব যেন শেরের বিপুল ঘর্মস্রোতে ধুয়ে গেছে।

অর্থহীন ছন্দহীন কথার আবেগে সে-সময় শের একবার বলেছিল—তুই দোজাখের হুরী (নরকের পরী), আমায় বুঝি সেখানেই টেনে নিয়ে যাচ্ছিস ?

বিরাট পরিতৃপ্তির বোঝায় মধুভরা ফুলের মত লজ্জায় নতশির লছমী পাল্টা প্রশ্ন করেছিল—এর নাম বুঝি নরক ?

—না নরক নয়, বেহেস্ত। আবেগক্লান্ত কণ্ঠে শের তার পূর্বোক্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল।

—আর আমি কে ? প্রজাপতির পাখার নিঃশব্দ শব্দের মত লছমীর মধুমদির স্বরের প্রশ্ন।

—হুরী ! বেহেস্তের হুরী—

এখন মনে হচ্ছে ভুল। সব ভুল। এ স্বপ্ন নয়, স্বপ্নভঙ্গও নয়। শের কেউ নয় তার। কোনদিন কেউ ছিল না সে। হবেও না কখনো। শের তাকে কখনো কিছু দেয়নি। দেবার ক্ষমতা তার নেই।

—আমি তোর কাছে কিছু চাই না। লছমী যেন অতিপ্রাপ্তির বোঝায় কুণ্ঠিত হয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে।

তবু শের দেবার আগ্রহে বার বার প্রশ্ন করেছে—কিছু না।

—কিছু না, কিছু না—লছমী কতদিন পূর্ণপ্রাপ্তির অবসাদ নিয়ে প্রতিবাদ করেছে—মরদের দান তো গায়ে গা না ছুঁয়ে দেওয়া যায় না ! সে সব আমি চাই না।

—তোর দিল ছুঁয়ে আমি নিজের জিগর (হৃদয়) দিতে পারি, সেটা নিবি তো? শের হয়তো বা কৌতুক করেই বলেছে।

কিন্তু লছমী পরম বিশ্বস্ততার সঙ্গে তন্মুহূর্তেই জবাব দিয়েছে—সে আর তুই দিবি কি, আমি তো কেড়েই রেখেছি!

—কবে।

লছমী ঠোঁট উল্টে সময় গণনার ভান করে, ভ্রূ দুটিও সেই সঙ্গে কুঞ্চিত করে—তা কি হিসেব করে বলা যায়! নিজের যা পাওনা কেউ তার এত হিসেব রাখে না। হিসেব রাখতে হয় তখন, যখন পাওনার বদলে ধার নিতে হয়। তারপর অল্প একটু বিরাম দিয়ে সে আবার বলে—কিম্বা দান। নয়তো—

কথাটা শের তাকে শেষ করতে দেয়নি। লছমীর বড কথায়-ভরা মুখ বন্ধ করতে একটা লঘুসুরের সিনেমা সঙ্গীত বিকৃত কণ্ঠে গেয়ে উঠেছে।

লছমী তার মুখে তাড়াতাড়ি হাত চাপা দিয়ে বলেছে—তোর রূপ কি কোথাও নেই! না শরীরে, না বচনে. না—

—না—? সকৌতুক উল্লাস নিয়ে শের বাকিটা শুনে নিতে চেয়েছে।

—জানি না! ঝঙ্কৃত সুরে এইটুকু বলে লছমী চুপ করে গেছে। তার মুখ দিয়ে আর কোন শব্দ, কোন কথা উচ্চারিত হয়নি। শেরই তাকে অবসর দেয়নি। লছমী তার একটা আচরণে পুলকিত বিস্ময় নিয়ে মনে মনে বলেছে—লোকটা যেন কি—বর্বর—একান্ত বর্বর!

মান অভিমানের বেড়া ডিঙিয়ে কয়েকটা দিন নির্জীবের মত কেটে গেল। হিসেব করে লছমী। গুনে দেখে। গুনে, সে মনে মনে

অনুভব করে শেরের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ঘটে গেছে তার। তা না হলে মাঝের দিনগুলি শূন্যে প্রসারিত ব্যর্থতার হাত নিয়ে ফিরে আসত না।

শূন্য দিনকটা কেটে যাওয়ার পর শের একদিন অতি প্রত্যূষে কুস্তির আখড়ায় পালোয়ানী চুকিয়ে লছমীর ঘরে উপস্থিত হল। হাসি-হাসি মুখ নিয়ে তাকাল চতুর্দিকে, তারপর ডাকল লছমী, মেরী বনময়ূরী!

—যা তুই এখান থেকে, আমি তোর কেউ নই।

গতরাতে খেমটায় শোনা গানটা শের সুর করে গেয়ে ওঠে। লছমীর কথার উত্তর দেয় না। গানের ফাঁকে ফাঁকে নিজের পালিত জীব-গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধান করে। বাহাদুর শেরের সঙ্গে থাকে। লছমীর হেফাজতে থাকে একটা নেউল, একজোড়া টিয়া পাখি আর কয়েকটি কাঁকড়া বিছে। এদের বহুদিন দেখা হয়নি। লছমী কটাকে রেখেছে আর কটার বিনাশ সাধন করেছে, শের ঘুরে ঘুরে তার তথ্য সংগ্রহ করে।

লছমী নির্বিকার শেরকে অভিমানের শেল বিঁধে জাগাবার চেষ্টা করে, বলে—শুনলিরে মুখপোড়া, তুই চলে যা, আমি তোর কেউ নই।

শের তার কথায় কান দেয় না, আপন মনেই গেয়ে চলে—

গোপী বেচে টোপি,
তামুলী বেচে পান,
গোপীকা সাত বেটা, সাতোঁ মুসলমান—
আর গোপী?

শের লছমীকে প্রশ্ন করে—আর গোপী? তারপর নিজেই আপন

প্রশ্নের উত্তর দেয়—গোপী হিজড়া। সাত বেটার মা হয়েও গোপী হিজড়া! তোর কথাটাও তেমনি, এত প্রেমের পর, 'আমি তোর কেউ নই'।

লছমীর মনের আকাশ থেকে অভিমানের জলভরা মেঘ নির্মূল হয়নি, বরং শেরের হঠাৎ উপস্থিতির আলোয় তার মনের তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার আরো সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে। শেরের দিকে তাকাবার ইচ্ছা পর্যন্ত থাকে না। অলক্ষ্যকে লক্ষ্য করে তবু সে এতক্ষণ দু' একটা কথা বলেছে, কিন্তু এবার আর আত্মসংবরণ করতে না পেরে বললে—তুই মানুষ না কি, আমি বুঝে উঠতে পারি না!

শের এবার মুখ টিপে হাসল। কাঁকড়া বিছেগুলোকে স-ছিদ্র মাটির হাঁড়িতে ভরতে ভরতে বললে—

তেরী ইস্ক্‌নে মুঝে বরবাদ কিয়া,
ইনশান থা ম্যায়, হায়মান বন্ গয়া!

—তোর প্রেম আমায় নষ্ট করে দিল লছমী, আমি মানুষ হয়ে জন্মেও অমানুষ হয়ে গেছি।

লছমীর সদর কানাগলির মধ্যে শেষ বাড়িখানা। এখান থেকে বড় সড়কের সরকারী জলের কলটা ঠিক দেখা যায় না, তবে নিচে বাঁধানো চত্বরটা নজরে পড়ে।

লছমী টের পায় না, কখন সে নিজের অজ্ঞাতেই সদরে এসে দাঁড়িয়েছে। বড় রাস্তায় মাইকে গান দিয়েছে। হয়তো কোন সিনেমার বিজ্ঞাপন। গানটা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বহুবার শুনে লছমীর প্রায় কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। তবু ভাল লাগে গানটা। পুরনো বলে মনে হয় না। সেই গানের আকর্ষণেই বোধহয় সে সদরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু গানটা তখুনি থেমে গেল। সম্পূর্ণ হয়নি যদিও, তবু থামল। মাইকে অন্য কিছু ঘোষিত হচ্ছে। কান পেতে শুনলে লছমী। সিনেমা নয়, চোখের কাজলের বিজ্ঞাপন। বেশ বলছে লোকটা। অঙ্গহীন মানুষ পূর্ণাঙ্গ জীবন অতিবাহিত করতে পারে, কিন্তু সেই অঙ্গ যদি হয় চোখদুটি! এর সম্বন্ধে বক্তার নিজস্ব কোন মতামত নেই, শ্রোতা তা অনুমান করে নিক। নিজের চোখদুটি মুহূর্তের জন্য বন্ধ করে দেখুক, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকায় গড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক ধূম্রকুণ্ড ব্যতীত অন্য কিছুই বোধ হবে না। জীবনের সমস্ত অর্থ একটা নিরর্থক শূন্যতায় পরিণত হবে। তাইতো রাধারাণী তার জীবনের শেষ দিনটির কথা স্মরণ করে বলেছিল—

সারে তনকো খাইও কাগা,
চুন-চুন খাইও মাস—
ঈন দো নয়নোঁ ন খাইও কাগা,
প্রিয়া মিলনকী আশ!

আমি বাঁচব না। মরবই একদিন। সেদিন শ্মশানের কাক আমার সমগ্র দেহটা ভক্ষণ করবে, কিন্তু তবু এই মিনতি করি, সে যেন আমার চোখ দুটির প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রদর্শন করে। তার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার মুখ থেকে যেন এ'দুটিকে অব্যাহতি দেয়। নয়তো লোকত্তর জগতে গিয়ে আমি সেখান থেকে প্রিয়সন্দর্শনে বঞ্চিত হ'ব। আমার জাগতিক মৃত্যু রূপে পরিগণিত হবে! কিন্তু যে মৃত্যু আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় পরিসমাপ্তি আনবে, সে মৃত্যু আমি চাই না। সে মরণ কামনা করি না। সর্বসত্তা হারাবার ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

লছমীর অবাধ্য অনায়ত্ত দৃষ্টি গলির মুখ ছাড়িয়ে সরকারী জলের

কলের চত্বরে নগণ্যের ভিড়ে অনন্য মানুষটির অনুসন্ধান করে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে, সুবিশাল গাঙ্গেয় উপত্যকার মত উদার প্রশস্থতা মাখানো পৃষ্ঠদেশ, আর অশান্ত বর্বর বাহুদুটি। এর বেশি লছমী চায় না। কাছে যেতে চায় না, বাহুবন্ধনে ধরা দিতে চায় না। শুধু চোখের দেখাই দেখতে চায়। দেখতে চায় দূর থেকে। দূর আকাশলোক থেকে পৃথিবীর মানুষটিকে!

•

লছমীর রাশিচক্রে সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ হঠাৎ যেন একসঙ্গে বক্রী হয়েছে। সম্ভবপর সুফল অনাস্বাদিতই থেকে যাচ্ছে আজকাল। সকালে উঠেই লছমীর বুক কেঁপে ওঠে। আর একটা দিন এল। সঙ্গে আরো খানিকটা অনাকাঙ্ক্ষিত নতুন অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা। কিন্তু কি আসবে, কোন পথে আসবে, তা পূর্বাহ্ণে তিলমাত্র অনুমান করা যায় না। তবে এটুকু নিশ্চিত—ঘটবেই কিছু। মধ্যরাত্রির পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তার অত্যাচার-জর্জরিত দেহের সমস্ত অণু-পরমাণু শ্রান্তির বোঝায় ঝিমিয়ে পড়েও একটা আনু-মানিক আশঙ্কার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না।

তবু আজ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তেমন কিছু ঘটেনি। সারাদিনের মধ্যে শের একবারও দর্শন দেয়নি, অতএব নিয়মিত কলহ বচসা গঞ্জনা আর অশ্রুপাত থেকে লছমী আজকের মত অব্যাহতি পেয়েছে। দুপুরের দিকে একবার বুকের ভেতর কেমন মুচড়ে উঠেছিল—রাস্তা থেকে একটা গোলমালের আভাষ ভেসে এসেছিল তখন। গোলযোগের কেন্দ্রবিন্দু শের নয়, একটা বছর চার বয়েসের নামগোত্রহীন নরশিশু—কথাটা জানতে পেরে লছমীর হৃদয়াক্ষেপ বন্ধ হয়। ছেলেটা গাড়িচাপা পড়ে মারা

গেছে। গেছে ভালই। বেঁচে থাকলেও সে মহাভারতের কোন পুণ্যকীর্তি পুরুষের মত হয়ে উঠত না।

দুপুরের পর থেকে প্রতিটি মুহূর্ত ভালয়-ভালয় সন্ধ্যার সমীপবর্তী হতে লছমী অন্তর থেকে উৎসাহিত হয়ে উঠল। আজকাল তার সব বিষয়ে অনুৎসাহ জাগে। নিয়মিত সান্ধ্যব্যবসায়ে মন দিতে ইচ্ছে হয় না, আমার অভ্যেসটাকেও অস্বীকার করতে পারে না।

আজ লছমী সমস্ত শৈথিল্য ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল। মাথার রুক্ষ চুল ঘষে ঘষে তেল মাখল। কেশবিন্যাসে একটু কষ্টসাধ্য বৈচিত্র্যের স্পর্শ দিল। সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে নিল। মুখ ধুতে গিয়ে মনে পড়ল ক'দিন অত্যধিক পান খাওয়ার জন্য দাঁতগুলো তরমুজের বিচির মত কাল্‌চে দেখাচ্ছে। মনে হতে দ্বিতীয়বার ছাই ঘষে দাঁত মেজে নিলে। গা ধুল তারপর।

প্রথম বাসরে তামাকবাবুর উপহার দেওয়া রেশমী শাড়িখানা—যার দাম নাকি কমপক্ষে এক'শ টাকা—সেটাই তোরঙ্গ খুলে নির্দ্বিধায় বের করল। কোন শ্রেণী গ্রাহক জুটবে, শিল্পরসিক অথবা নির্মম চর্মরসিক, পরণের শাড়ি অটুট রাখবে, কিনা, এ সব অবশ্য লছমীর মনে এল। কিন্তু সে পরক্ষণেই মনস্থির করে নিল—বেশি বাড়াবাড়ি করেছ কি ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব। টাকাই নিয়েছি, কিন্তু বিবি-আনার খৎ তো তোমার চরণে লিখে দিইনি? জিগ্যেস কর গিয়ে ঐ কসাই হানিফকে, সে জানিয়ে দেবে লছমী বিবি কি চিজ! সোহাগ দেবে গা উপচে, আবার জুতোর বাড়িও দেবে গায়ের চামড়া ফাটিয়ে। পয়সা দাও তোমার পা চেটে দেবে, না দিলে মুখে লাথি মারবে। মে'মানুষের কাছে আসে, অথচ মুখে কখনো লাথি ঝাঁটা পড়েনি এমন ভাগ্যিমন্ত

বেটাছেলে ছুনিয়ায় আছে কি না, সে বিষয়ে লছমীর সন্দেহ আছে। সীতিয়ার প্রস্তুতিপর্ব শেষ হয়নি। এখনো সে একটা পছন্দমত কাঁচুলি নির্বাচনে ব্যস্ত। প্যারিস প্লাস্টারের আস্তরণ দেওয়া বক্ষা-বরণটা খুঁজে পাচ্ছে না।

ঘরের দরজার কাছে লছমীর উপস্থিতির ছায়াপাত হতে সীতিয়া একবার চমকে উঠে সেদিকে তাকাল। তারপর লছমীকে উদ্দেশ্য করে বলল—ও লছমী। ভেতরে আয়; আজ কোনদিকে সূর্য উঠেছিল?

—কেন বলতো!

—তুই তো কোনদিন আমায় ডাকতে আসিস না? আমাকেই রোজ লছমীর দরজায় ধরনা দিতে হয়। কিন্তু আজ এত তাড়াতাড়ি যে, এখনো তো ম্যাটিন শো-এর সিনেমা ভাঙেনি? এ আবার ষোল রীলের বই, ভাঙতে সাতটা সওয়া সাতটা হয়ে যাবে। ও, আজ বুঝি পূর্ণিমার গঙ্গাস্নান করতে গাঁ থেকে শহরে যাত্রী এসেছে?

—তোর কি কিছু মনে থাকে না, পূর্ণিমা তো পাঁচ দিন আগে ছিল? বলতে বলতে লছমী হাসিমুখে ঘরে ঢুকল—এখনো তোর কাঁচুলি পছন্দ হয়নি? কি শখ বাবা, বুকে একজোড়া মাটির ভাঁড় না বাঁধলে যেন সব সাজগোজ মাটি হয়ে যায়! হাঁ রে সীতিয়া, কাল তোর যে বাবু এসেছিল, সে তো রোজই আসে, এক প্যাকেট করে সিগ্-রেট দিয়ে যায়, নেই?

প্যারিস প্লাস্টারের কাঁচুলিটা খুঁজে পাওয়া গেছে, খাটিয়ার নিচে পড়ে গিয়েছিল। সেটা সযত্নে বুকে বাঁধতে বাঁধতে সীতিয়া জবাব দিল—খুঁজে দেখ ওপাশের চৌকির কোণটাতে, বিছানার নিচে। আমার সিগরেট ভাল লাগে না, মনে হয় যেন নেমেনচুষ খাচ্ছি!

—তবে নিস কেন, আমার জন্যে ?

—তোর জন্যে নিতে বয়ে গেছে আমার! বাবুর খেয়াল—বলে, সিগ্‌রেট মুখে নিয়ে আমায় নাকি কুইন ভিক্‌টোরিয়া মনে হয়!

—ভিক্‌টোরিয়া সিগ্‌রেট খেত বুঝি ?

—আমি তার কি জানি, সীতিয়া বিরক্তি-ঝরা স্বরে বললে, আমার আঁচলে টাকা আর মুখে সিগ্‌রেট গুঁজে দিয়ে যদি কেউ, 'ইওর হাইনেস' বলে পায়ে চুমু খায় তাতে আমি কোন দুঃখে ক্ষয়ে যাব ? জানিস বাবু কলেজে ইংরেজী পড়ায়—তার কাছে পড়ে কত ছেলে জজ ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে। আর একজন আছে, তার সামনে ভিজে কাপড় পড়ে ঝাড়া একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলেই অনেক টাকা দিয়ে চলে যায়, কোন দিন গায়ে হাত দেয়নি। শুধু ভিজে কাপড় ঢাকা আমার শরীরটা নানা ভাবে দেখেই সে খুশি। অবশ্য গত শীতে এর জন্যে আমার নিউমোনিয়া হয়েছিল—চিকিৎসার খরচ সেই কবি মুখপোড়াই বউএর গয়না বেচে জুগিয়েছিল।···এরা আমাদের কাছে আসে বৈচিত্র্যের জন্যে; দেহভোগের জন্যে নয়। এ ধরনের বিকৃত-রুচির খদ্দের পাওয়া মহাভাগ্যের কথা, কিন্তু সব সময় এদেরও ভাল লাগে না। ক্যালেনডারের ছবি দেখে আদেখলে ব্যাটাছেলে-গুলো যেমন হাঁই হাঁই করে, তেমনি আমিও মাঝে মাঝে খাই-খাই করি।

নতুন একটা শব্দে আকৃষ্ট হয়ে লছমী প্রশ্ন করলে—এরা কিসের জন্যে আসে বললি!

—বৈচিত্র্যের জন্যে।

—সেটা কি ?

—তোর মুণ্ডু—

সীতিয়া কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলেছিল। তার হাসির শেষ অংশের কানা ধরে টানলে লছমী—হাসলি যে? বলে সে নিজেও খানিকটা হেসে নিলে। হাসলে অকারণেই, অথবা সীতিয়ার হাসির সংক্রমণে।

পরণের সায়ার ওপর আর একখানা সায়া চাপিয়ে নিয়েছে সীতিয়া—গুরুভার বুকের সঙ্গে গুরু নিতম্বকে মানিয়ে নিয়েছে।

লছমী বললে—হ'ল তোর? বাবা, সাজ শেষ হয় না, যেন তোর সাজ দেখতেই লোক আসে!

জবাব দিলে সীতিয়া—ব্যাস হয়ে এল, প্রতিমা গড়া প্রায় শেষ। ওপরে চিকন চাকন, ভেতরে খড়ের গাদন।···দিন দিন আমার শরীর ভেঙে পড়ছে লছমী—সীতিয়া নিজের একখানা হাত লছমীর দিকে বাড়িয়ে দিলে—আর বেশিদিন বোধহয় পারব না। বছরে তিনবার যদি পেট ভাঙাতে হয়—। লোকগুলো নেহাৎ মড়াখেকো, তাই আমার কাছে আসে।

লছমীর হাসিহাসি উজ্জ্বল মুখখানা সীতিয়ার কথায় ছাইচাপা আগুনের মত কোথায় তলিয়ে গেল। কতকটা সমবেদনার সুরে সে বলল—তোরই বা এত হয় কেন? আমার তো কখনো হয়নি! সাবধান হতে পারিস না?

মুখের ক্লিষ্ট হাসির ওপর সস্তা পাউডারের প্রলেপ দিতে দিতে সীতিয়া উত্তর দিল—সাবধান! করে খেতে হবে না? সাবধান হতে গিয়ে মাসে বিশদিন ঘরে বসে থাকি? জানিস লছমী, একদিন স্বপ্ন দেখছিলুম—পূর্বজন্মে আমি ছিলুম মা বসুমতী! এ কথা ভাই কাউকে বলিস না, শুনে হাসবে। আমার গালমন্দ সহ্য হয়, কিন্তু কেউ ব্যঙ্গ করলে ইচ্ছে করে তার গালে ঠাসঠাস করে

চড় কষিয়ে দি'। কি করব, গাঁজাখোর মে' মানুষ, একটু রগচটা তো হবেই! ঝিমিয়ে থাকি, আবার ফুঁসেও উঠি।...নে দেখতো একবার, মুখে পাউডার লেপে নেই তো? তোর জন্যেই তাড়াতাড়ি করছি, কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হবে! তুই মাঝে মাঝে বড় কমে কাজ করিস, আজ কিন্তু পাঁচের কম রাজি হোস না তুই কম নিলে, আমাদেরও নিতে হয়।

লছমী এ অভিযোগের উত্তর দেয় না। কথাটা মিথ্যে নয়। অনেক সময় চড়া-বাজার তার জন্যেই নেমে যায়।

দরজায় চাবি দিতে গিয়ে সীতিয়ার মনে পড়ে, লছমী সিগারেট চেয়েছিল—তুই সিগরেট নিসনি?

—ও মা, কথায় কথায় ভুলে গেছি—থাকগে।

—না, না, থাকতে যাবে কেন, এ কি আমার বাপের পয়সার সম্পত্তি—আমি তো বিলিয়েই দি'। সীতিয়া আবার কপাট ঠেলে ঘরে ঢুকে লণ্ঠন উস্‌কে দেয়। ঘরটা আলোকিত হলে বিছানা হাতড়ে একটা সিগারেটের প্যাকেট এনে লছমীর হাতে দিয়ে বলে—রাখ তোর কাছে।

—এতগুলো!

—পুরো দশটা নেই, দু' তিনটে তো উজবুক মাস্টার নিজেই খেয়ে গেছে।

গৃহপ্রাঙ্গণ থেকে গলির মুখের কাছে আসতে বড়জোড় আধ মিনিট সময় লাগে, এইটুকু পথ হেঁটেই সীতিয়ার জলতেষ্টা পেয়ে গেল। নিষ্ফল প্রত্যাশায় জলের কলটা টিপল সে।

—কলে কি আর এখন জল আছে! লছমী স্নিগ্ধ মমতার সঙ্গে প্রশ্ন করল—জল খাবি?

—জলই নেই, তো খাব কি ?

লছমী উত্তর দিল—থাকবে কোথা থেকে, কটা বাজে খেয়াল আছে, সাড়ে ছ'টা। সাড়ে পাঁচটায় জল চলে যায়।

—তাই তো বটে! প্রতিদিনের পরিচিত জিনিসটাকে সীতিয়া যেন নতুন করে অনুধাবন করে। সবই সময় ধরে চলছে। কলের জল সময়ে আসছে, সময়ে যাচ্ছে। এখনো এখানে কেউ জোটেনি, ঠিক সিনেমা ভাঙার পর জুটবে। খদ্দের জুটবে সময় মত। থাকবে সময় ধরে—

—কি বাজে বকছিস তুই। লছমী সীতিয়ার হতাশাব্যঞ্জক সময়-তত্ত্বের উদ্‌ঘাটনে বিরক্ত হয়ে বলে—জল খেতে চাস তো বল ?

—কোথায় পাবি !

—কেন ঐ নর্দমায় ? জবাবটা বোধহয় অকারণ রূঢ়তা নিয়ে এল, তাই লছমী অত্যন্ত নরম সুরে পরবর্তী অংশটা শেষ করল—দাঁড়া, ঘর থেকে এনে দিচ্ছি।

—কেন মিছিমিছি—আমি নিজেই যাচ্ছি।

—থাক তোকে যেতে হবে না, আমি এনে দিচ্ছি। তুই এখানেই থাক।

লছমা জল আনতে চলে গেল। সীতিয়া জনমানবশূন্য চত্বরটায় উবু হয়ে বসে পড়ল। যতক্ষণ কলে জল থাকে ভিড় আর অশ্রাব্য গালিগালাজের চাপে জায়গাটা ভীমরুলের চাকের মত হয়ে থাকে। মিনিট দুয়েকের মধ্যে লছমী একঘটি জল এনে সীতিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিল। সীতিয়ার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল।

—জল নে।

—দে—

জল পান করল সীতিয়া। তারপর একটা পূর্ণ পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললে—আমার দিন বোধ হয় শেষ হয়ে আসছে লছমী—ঐ দিনটাতেও মুখে জল দিবি তো ?

—তোর মুখে কেন জল দেব—ভর সন্ধ্যেয় এ সব কথা লছমীর ভাল লাগে না। দুজনেই সহযাত্রী, সীতিয়ার দিন শেষ হওয়া মানে লছমীরও দিন শেষ হওয়ার ইঙ্গিত।

লছমী বলে—যদি দিতে হয়, জল দিয়ে আসব তোর শত্তুরের মুখে। কে তোর শত্তুর আছে বল ?

সীতিয়া হাসল। রাস্তার আলোটা পথের ওপারে, সীতিয়ার নীরব হাসি লছমী দেখতে পেল না।

—আমার শত্তুর তো ভগবান, তার মুখে জল দেবার মত ভাগ্য করে কে এসেছে ?

—শুধু ভগবানই তোর শত্তুর, আর কেউ নেই ? আমার তো দুনিয়া জুড়ে শুধু শত্তুর, আর শত্তুর। আমি নিজেই নিজের শত্তুর।

সীতিয়া উঠে দাঁড়াল, লছমীর পাশে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বললে—আমার দ্বিতীয় কোন শত্তুর নেই। কেউ নেই। জানিস লছমী, আমার মা ছিল নামকরা বাইজী। সুন্দরীবাঈর নাম তোরাও শুনেছিস। তার ইচ্ছে ছিল, আমাকে নিজের মত করে গড়ে তোলে। আমার যে রূপ নেই, তা মা'র নজরে পড়েনি। অবশ্য প্যাঁচাও নিজের ছানার রূপের অভাব টের পায় না। বাইজীর পেটে একটু বিদ্যে থাকলে ব্যবসা ভাল জমে। তাই মা একটা ঝুটা বাপের নাম ঠিকানা দিয়ে আমায় মিশন স্কুলে ভর্তি করে দিলে। কয়েক বছর পড়েছি, শেষে মা মরবার পর পড়া ছাড়তে হ'ল। মিশন স্কুলে বাইবেল পড়ানো হ'ত। বাইবেলে লেখা আছে,

মানুষের শত্রু শয়তান। আমি তা মানতে পারিনি। মা'র রূপের এক আনাও আমি পাইনি। গানের বেলাতেও ওস্তাদ মাকে বললে—বিবিজী, বোপদেব নামে একটি ছেলের গল্প আছে, সে নাকি পাথরের ক্ষয় দেখে লেখাপড়ায় মন দেয় এবং নিজের মগজ ক্ষয় করে মহাপণ্ডিত হয়। কিন্তু এ গল্প শুনে তোমার মেয়ে যদি গলা ক্ষয় করতে বসে, তাহলে ক্ষয় রোগই হবে, গান হবে না। মা তবু ক্ষীণ আপত্তি করলে, আমার সীতার গলা তো খুব মিষ্টি, কথাবার্তাও কেমন সুন্দর। ওস্তাদ মেনে নিলে কিন্তু বললে, তা ঠিক বিবিজী, কিন্তু সুর চড়ালে ঐ মিষ্টি স্বরে যে পাকা বাঁশের মত গাঁট গজায়, তার কি করবে? আমি তো আর করাত হাতে নিয়ে গান শেখাতে পারি না! অগত্যা মা আমায় এগারো বছর বয়েসেই আসল কাজে তালিম দিতে আরম্ভ করলে। আমি তখন ইস্কুলে যাচ্ছি। বছর তেরো বয়েসে প্রথম জানলুম যে আমি মা হতে চলেছি— আমার নিজের বাপই আমার সন্তানের বাপ হতে যাচ্ছিল—কিন্তু যা হোক, তার সন্তানের মা আমায় হতে হয়নি। এর পর প্রতি বছর এই একই কথা দু'চার বার করে নিজের রক্তে-নাড়িতে টের পাই, কিন্তু সেটুকুই শেষ জানা। সত্যিকারের শেষ জানবার সাহস হয় না। সীতিয়া হাসল একবার—আমার এ গল্প শুনে এক ডাক্তার চমকে উঠে বলেছিল, তুমি বেঁচে আছ কি করে! উত্তর দিয়েছিলুম, ভগবানের দয়ায়। কিন্তু তখন মনে মনে বলেছিলুম, তার অভিশাপে। তারই শত্রুতায়। তোরা হয়তো বলবি, দোষ আমার মায়ের। দোষ আমাদের সমাজের। আমিও এ ভাবে ভাবতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু সব চিন্তার জল গড়িয়ে গিয়ে দাঁড়ায় ভগবান বাবুর কাছাকাছি। ঐ নির্বিকার নিষ্ঠুর অদৃশ্য মানুষটির কাছে।

সীতিয়া নীরব হল। কে একজন বার কয়েক বড় রাস্তায় পা ঘষে হঠাৎ গলির মুখে এগিয়ে এল। হাতের টর্চ ফেলে দু'জনকে নিরীক্ষণ করল। দুজনেই মুচকি হাসল। সীতিয়া বোধহয় একবার লোকটির হাত ধরে টানতেও গেল, কিন্তু লোকটা নিমেষে তার কাছ থেকে সরে গিয়ে লছমীর কাঁধে হাত রেখে তাকে দ্রুত গলির ভেতর প্রবেশ করতে ইঙ্গিত করল।

—টাকার বটুয়া ভুল করে বাড়িতে ফেলে আসনি তো, পাঁচ টাকা লাগবে? গলিতে ঢোকবার আগে লছমী প্রশ্ন করল।

—হুঁ! উত্তর স্পষ্ট নয়; কিন্তু লোকটার আত্মসম্মানে যেন ঘা লেগেছে, এটুকু বুঝতে লছমীর কোন অসুবিধা হল না। খুশি হয় লছমী। আত্মসম্মানজ্ঞানী অথচ অপরাধপ্রবণ লোক পাপের জায়গায় এসে দু-হাত উপুড় করে প্রমোদ সংগ্রহ করে, লছমীর অভিজ্ঞতার খাতায় এ তত্ত্বজ্ঞানটুকু সুস্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে।

লোকটিকে গলির মধ্যে কিছুদূর পর্যন্ত অনুগমন ক'রে লছমী আবার আগেকার জায়গায় ফিরে এল। সীতিয়ার চোখদুটিতে তখন খানিকটা অগ্ন্যুৎপন্ন হয়েছে।

লছমীর দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে সীতিয়া প্রশ্ন করল—ফিরে এলি, দরে পোষাল না বুঝি?

—না, ঘটিটা—

জল খেয়ে সীতিয়া ঘটিটা কলের চত্বরে নামিয়ে রেখেছিল, লছমী সেটা হাতে তুলে নিল। সীতিয়ার অগ্নিময় দৃষ্টি তার চোখ এড়িয়ে যায়নি, কিন্তু তাকে বিঁধতে পারেনি। এমন তারও হয়। পরের সৌভাগ্যে তার দৃষ্টিও হিংসের আগুনে প্রাণবন্ত হয়। শুধু তার কেন, প্রত্যেকেরই হয়। অপরের গ্রাহক দেখলে মনে হয়, এ যেন

নিজের রূপগুণ, ব্যবসা কৌশল আর শিকারবুদ্ধি কৌলিন্যের পরাজয়। তখন অবর্ণনীয় বিদ্বেষ এসে মনের প্রতিটি শুভবুদ্ধির স্তর আচ্ছন্ন করে। কিন্তু এ মনোভাব এবং ভাগ্যবতীর সঙ্গে অচিরাৎ সৃষ্ট মানষিক ব্যবধান বেশিক্ষণ থাকে না। সীতিয়ারও থাকবে না। এখন সে কয়েক মুহূর্ত ধরে লছমীকে অভিসম্পাত দেবে, তারপর মাথা ঠাণ্ডা হলে বুঝবে, কোন দোষ নেই লছমীর, সে বেচারী তারই মত এক অভিশপ্ত জীব। সব অপরাধ ঐ ভগবানবাবুর। ঐ জীবন শত্রুর। সীতিয়ার জন্মমুহূর্ত থেকে সে তার সঙ্গে শত্রুতা করে চলেছে। তার প্রতি কর্মে। প্রতি পদক্ষেপে। এবং মৃত্যুদিন পর্যন্ত এই শত্রুতার বিষ-তেজ হারাবে না।

সীতিয়া নিজেই তো বলে—আমাদের জীবন তো নয়—

—জীবন নয়, তবে কি এটা? লছমী নিজের বুকে আঙুল ছুঁইয়ে প্রশ্ন করে—এই যে এখানে ধুকধুক করছে!

—গো-ভাগাড়; দেখিস না চারিদিকে শকুনি উড়ছে? এক-একটা মানুষ গায়ের মাংস নিয়ে এমন নিঘিন্নের মত টানাছেঁড়া করে যে মড়াখেকো শকুনিও লজ্জা পেয়ে যায়।

সীতিয়ার বিশ্লেষণ দিয়ে নিজের জীবনকে ধিক্কৃত করে লছমী নিজেকে সীতিয়ার নীরব অভিশাপের বন্ধন থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করে।

লছমী অপেক্ষমাণ অতিথির কাছে ফিরে এল। তারপর বিনা ভূমিকায় বললে—চল। টর্চ আছে তো, নিভিয়ে দিলে কেন? এখানে কেউ তোমার শ্রীমুখ চিনতে আসবে না। আর যদি

চিনতে পারে, সে-ও তোমায় দেখে মুখ লুকিয়ে নেবে। টর্চ জ্বাল। সামনে একটা পথ-চেরা নর্দমা আছে, পা পড়লে পাঁক ছিটকে মুখে লাগবে।

ক্রশড্রেন পেরিয়ে লছমীর বাড়ির আঙিনায় ঢুকল। অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরের সুমুখে উপস্থিত হ'ল। তারপর দরজার পাশে দেয়ালের গায়ে হুকে ঝোলানো লণ্ঠনের শিখা বাড়িয়ে কুলুপ খুলে ঘরে ঢুকল।

লণ্ঠনটা ঘরের মেঝেয় নামিয়ে রেখে লছমী বললে—এ তোমারই বাড়ি। তোমার ঘর। বস।—কথাকটা বলে একটু বিনম্র হাসি হেসে বললে—পান আনিয়ে দেব?

—না।

—মদ?

—না।

—অন্য কোন নেশা?

—না।

—তবে একটা সিগরেট খাও? জলের ঘটি নিয়ে যাবার সময় সীতিয়ার দেওয়া সিগারেটের প্যাকেটটা কুলুঙ্গিতে রেখে গিয়েছিল। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে পরম বদান্যতায় লোকটির দিকে প্রসারিত করে লছমী দেশলাই জ্বালবার উপক্রম করল।

—আমার হাতে এত বাজে সময় নেই, পৌনে আটটায় ট্রেন ধরতে হবে। লোকটি উপহার প্রত্যাখ্যান করল।

লছমী জবাব দিতে গেল—আমিও বাজে সময়ের দানছত্তর খুলে বসিনি, কিন্তু এ কথা না বলে সে অনুতপ্ত সুরে বললে—আমিও তোমায় বেশিক্ষণ আটকাব না। কিন্তু এক মিনিট বসতে হবে—

অতিথিকে খাটিয়া দেখিয়ে দিয়ে লছমী ঘরের অপর কোণের দড়ির আলনা থেকে একটা সাধারণ আটপোরে শাড়ি টেনে নিয়ে বাইরের অন্ধকারপ্রায় বারোয়ারী উঠানের অন্ধকারতম কোণটিতে গিয়ে দাঁড়াল। অন্যদিন হলে অতিথির সামনেই সে অসঙ্কোচে পরণের শাড়ি বদলে নিত এবং সেই সময়টুকু দু-একটা প্রেমের বুলিও আওড়ে যেত।

সন্ধ্যা সমাগমে গলির মুখে গিয়ে দাঁড়ানো থেকে, অতিথি সংগ্রহ করা, তার আপ্যায়ন, আসন দেওয়া—সবটাই তো হৃদয়-সম্পর্ক-বিহীন যান্ত্রিকতা। তবু এর ভেতরই লছমী আজ সাময়িক অব্যাহতি লাভের এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে। শাড়ি বদলাতে গিয়ে ইচ্ছে করেই দেরি করে সে। অপরিচিত মানুষটাকে অকারণে আটকে রেখে বিব্রত করতে ইচ্ছে হয়। শিথিল অবসর দিয়ে ত্বরিত ক্রিয়ার যান্ত্রিক অনুষ্ঠান সাঙ্গ করার প্রবল বাসনা জাগে। মোটের ওপর ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি দিয়ে নয়, একটা বে-হিসেবী অনুভূতি আর লঘু আচরণের মধ্যে আজকের রাতটা কাটিয়ে দিতে চায় লছমী।

উঠানের অন্ধকার নিয়ে লছমী ঘাঁটাঘাটি শুরু করে দেয়। অন্ধকার হাতড়ে বিনা কারণে এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করে। তার মধ্যেই অন্ধকারের কলেবরে গা লুকিয়ে পরণের শাড়িটা বদলে নেয়। অন্ধকার কুয়োতলায় গিয়ে মুখের রঙের প্রলেপ ধুয়ে নেয়। আজ আর অন্য লোক বসাবে না বলে স্থির করে।

ঘরের মানুষটা কি করছে এতক্ষণ? কি করছে কামাতুর অপরিচিত প্রণয়ী! ট্রেন ফেল হবার দুশ্চিন্তা আর আসঙ্গলিপ্সায় দ্বন্দ্ব বেধে

গেছে অবশ্যই। গলা ঝাড়ছে। ডাকছে লছমীকে! ডাকুক। অপেক্ষা করতে ইচ্ছে হয় করুক, বিদায় হতে চায় হোক। কিম্বা গলির মুখ থেকে সীতিয়া বা অন্য কাউকে ধরে আনুক। লোকটাকে সুখ বা সাহচর্য পরিবেশন করে নয়, কিছুটা বিব্রত করে লছমী আজ একটা নতুন ধরনের কামপরিতৃপ্তির আস্বাদ নিতে চায়।

—উঃ। হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে একটা আর্তস্বর ভেসে এল। চিৎকারের শব্দে লছমীর সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, ছুটে ঘরে ঢুকল সে।

—কি হয়েছে! লছমী কোনক্রমে রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করল।

—সাপ কামড়েছে—নিজের ডান উরু দু-হাতে চেপে ধরে লোকটি বললে কোন রকমে। যেন আততায়ীর হাতে আহত মৃতপ্রায় ব্যক্তির শেষ বিবৃতি।

সাপ! না, সাপ নয়। লছমীর মানসপটে নিমেষে কয়েকটা চিত্র দ্রুত-রেখায় রেখায়িত হয়ে গেল। সাপ নয়, কাঁকড়া বিছে। শেরের পোষা বিছেগুলো লছমীর তত্ত্বাবধানে থাকে। একটা হাঁড়িতে সছিদ্র-সরা চাপা দিয়ে শের ঘরের এক কোণে রেখে গেছে। আজ সকালে লছমী কিছু কীটপতঙ্গ আর মাকড়শার ডিম সংগ্রহ করে সেগুলিকে খেতে দিয়েছিল। হয়তো সেই অবসরে একটা নীলবর্ণ বিষাক্ত জীব—

লোকটিকে টেনে লছমী খাটিয়ার ওপর থেকে নামিয়ে দিলে। তারই টর্চের আলোয় তন্ন-তন্ন করে বিছানাটা খুঁজল। বিছানার এক কোণে লজ্জিত জীবটির দর্শন পাওয়া গেল। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল একবার। লছমী জানে লেজের দিকে ধরলে ভীষণ দর্শন জীবটার সব আস্ফালন সার হবে। সে এ'ভাবে বহুবারই ধরেছে।

এখন কিন্তু লছমী বিছেটাকে ধরতে গিয়েও ধরল না। নিজে ধরা পড়ার ভয়ে নিবৃত হ'ল। এই বিশেষ শ্রেণীর বিষাক্ত জীবটির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সকল তথ্য এতে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়বে। তাহলে ভবিষ্যতে এ' ঘরে আর লোক জুটবে না।

হাতের কাছে উপযুক্ত নিধনাস্ত্র না পেয়ে লছমী মশলা পেষবার নোড়া দিয়ে বিছানার নিরাপদ কোণে আশ্রিত অপরাধের নিশ্চল প্রতিভূর মত জীবটাকে এক ঘায়ে মেরে ফেলল।

—এস এখানে—মানুষটাকে এনে লছমী আবার খাটিয়ায় ওপর বসিয়ে দিল. তারপর তার আক্রান্ত স্থানটি উন্মুক্ত করে পরিচর্যায় তৎপর হ'ল। আক্রান্ত স্থানের ওপর আর নিচের দিকে দড়ির বন্ধন দিলে গোটাকয়েক। মুখে অভয় জানিয়ে বললে—ভয় নেই। এখানে কাছাকাছি একটা পুরনো ইটের পাঁজা আছে, সেখান থেকে আসে ; আমাকেও কামড়েছে কিন্তু কিছু হয়নি। আমি ওষুধ জানি, এখুনি সেরে যাবে।

একটুকরো ফিটকিরি এনে লছমী লণ্ঠনের মাথায় গরম করে লোকটির আক্রান্ত স্থানের ওপর চেপে ধরলে, বলল—বিষ টেনে নেবে এখুনি !

এ ওষুধ তাকে শেরই শিখিয়েছে, পরখ করে দেখবার অবসর আজ প্রথম এল।

ধীরে ধীরে অতিথির বিবেক-ঘেরা লজ্জা ও আশঙ্কার বেড়া উন্মোচিত হতে আরম্ভ হয়েছে। তার আর্ত চিৎকার ঘর আর বাইরের প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে গেছে। অন্যান্য ঘর থেকেও লোক জুটেছে লছমীর ঘরে। সহদেব-ভেড়ুয়া প্রায় প্রকাশ করে ফেলেছিল, বলে ফেলেছিল—বিছে কামড়েছে তো হয়েছে কি বাবু, এ তো

আপনাদের পেয়ারীলছমী—বিবির পোষা বিছে। বিবিজীর খেলনা!

সহদেবকে লছমী কোনদিনই আমল দেয়নি। তার সংগৃহীত খদ্দেরকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি। সহদেবের দালালী দিতে রাজি হয়নি। লোকটার অতি চটুল ব্যবহার আর গুটিকা-চিহ্নিত মুখের প্রতিটি কুঞ্চনে বিশ্রী ধরনের যৌনাবেদন দেখলে লছমীর ঘৃণা হয়। খানিকটা কৃতজ্ঞতার ভাবও যে না আসে, তা নয়। সহদেবকে দেখে লছমীর যেন নিজেকেও দেখা হয়ে যায়। দেখতে পায়, তার নিজের কুক্কুর-চর্বিত মাংসপিণ্ডের অবশিষ্টাংশ আজও অক্ষত আছে। কেউ কোনদিন সে জিনিসটা গ্রহণ করতে পারেনি। এক অদ্ভুত সামগ্রিকতা বোধ তার জর্জরিত জীবনে আজও টিঁকে আছে। এ তার প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তির জোরেই সে বেঁচে আছে। এরই বলে সে আজ অন্নজল গ্রহণ করছে। আর সময় অসময়ে ভগবানকে ডাকতে পারছে।

লছমী ধমক দিয়ে উঠল—তুই থাম সহদেব, কালো ভূত কোথাকার! মানুষের বিপদের সময় রঙ্গ করতে লজ্জা হয় না তোর? মানুষ না নরকের পোকা তুই? তুই কি!

—তোর বাপ—

লছমী ভুল করেছে, সহদেবের সঙ্গে এতখানি রূঢ় ব্যবহার করা তার উচিত হয়নি।

সহদেব লছমীর কথার জবাবে তার মুখের ওপরই বললে—রঙ্গ আমি করছি, না তুই—! ঘরের মধ্যে বিছে পুষে মানুষ খুন করিস, তুই ডাইনী। বের করে দেব নাকি হাঁড়িটা, হাটে ভাঙব সব?

—থাক ঢের বাহাদুরী দেখিয়েছিস! লছমী গ্রাহকের দৃষ্টি বাঁচিয়ে

সহদেবের প্রতি একবার করুণার্থীর মত বিনীত দৃষ্টিতে তাকায়। মিনতি ঝরা চোখে তাকিয়ে থাকে।

এত বড় সুযোগটা সহদেব সহজে ছেড়ে দেবে, তা লছমী অনুমান করতে পারেনি। কিন্তু তাই হ'ল। সহদেব যেন সেই মিনতি ধারায় নিমেষে গলে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে সেখান থেকে চলে গেল। কেবল নিজেই গেল না, উপস্থিত সকলকে একরকম জোর করে নিজের সঙ্গে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

কিন্তু শেরের টোটকা ওষুধ কার্যকরী হয়নি, আগন্তুকের দেহে বিষক্রিয়ার আস্ফালন লছমী দূর করতে পারলে না। পুরনো বিছের সরোষ-দংশনের বিষ তার সর্বাঙ্গে বাষ্পতরঙ্গের মত ছড়িয়ে গেছে। লোকটি মুমূর্ষুর মত বিছানায় লুটিয়ে পড়েছে।

অগত্যা লছমী উঠানে বেরিয়ে এসে অসহায় সুরে ডাক দিল—সহদেব!

—কি?—এক কোণের জমাট অন্ধকারই যেন সাড়া দিল—আমি এখানে আছি।

লছমী নিরুপায় কণ্ঠে বললে—লোকটা যে মরে যাচ্ছে সহদেব, অজ্ঞান হয়ে গেছে!

—মরুক না, তাতে তোর কি? মামার বাড়ির আবদার পেয়েছে নাকি? রাঁড় বাড়ি আসবে, বিছে কামড়াবে না, খুন হবে না—আবদার কত! তুই কি প্রাণ বাঁচাবার ঠিকে নিয়েছিস?

—না, না, সহদেব!

—তবে টেনে নিয়ে হাসপাতালে ফেলে আসি?

লছমী সে কথায় আরো ভীত হয়—তাতে যে থানা পুলিস হবে?

সহদেব লছমীর কাছে সরে এসেছে। অত্যন্ত সমীপ থেকে

হাসল। তার হাসির ছিটের সঙ্গে দু'একটা পানসুপুরীর কুঁচি এসে লছমীর যেন চোখে মুখে বিঁধল। তবু সে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারল না। সাহস হল না। প্রতিকূল অবস্থায় সহদেবের দেহের কূলটাই পরম আশ্রয় বলে মনে হচ্ছিল তার। সহদেবকে বিরূপ করতে সাহস হল না।

বরং সে সহদেবকে নিজের দেহের খানিকটা স্পর্শ উপহার দিয়ে তার বুকের কাছ ঘেঁষে ফিসফিস করে বলল—থানা পুলিস হবে না তো?

—সে আমি বুঝব। বিছে কামড়ালে আবার থানা পুলিস কি? সাপ বিছে কি মানুষকে কামড়ায় না? আর যদি তেমন কিছু হয়, তুই বলবি, আমি কি জানি, শের জোর করে আমার ঘরে বিছে-নেউল সাপ-খোপ রাখে। ধরতে হয়, তাকে ধরে নিয়ে যাও। ফাঁসি দিতে হয়, তাকে ফাঁসি দাও।

—না, না, তা আমি বলতে পারব না, মরে গেলেও না—শেরের সম্বন্ধে আপত্তি জানাতে গিয়ে লছমী নিজের অজ্ঞাতেই সহদেবের দেহের স্পর্শ থেকে অনেকখানি দূরে সরে গেল।

সহদেব আপাততঃ আর কাছে ঘেঁষবার চেষ্টা করল না। লছমীর ঘরের দিকে যেতে যেতে বললে—কিছু ভাবিস না, আমি থাকতে তোর ভাবনা কি?

—কোথায় যাচ্ছিস তুই?

সহদেব ঘর থেকেই উচ্চ কণ্ঠে জবাব দিল—তোর খদ্দেরকে হাসপাতালে ফেলে আসি, তুই একটা রিক্সা ডেকে আন? কিন্তু হাসপাতালে এটাকে ফেলে এসে আমি তোর ঘরেই ঘুমোব। ...শালার পকেটে সতেরোটা টাকা আছে, তোর বিছানায় রেখে দিলুম। এ' টাকা তোর।

লছমী বাইরে থেকে বলে—ছি ছি, কেন চুরি করলি!

—চুপ কর তুই, রিক্সা নিয়ে আয়। আমি না নিলে এ টাকা হাসপাতালের লোকই নেবে। এ দুনিয়ায় যে শুধু শুধু সাধু সাজতে যায়, সে শালা গাধা।

—হি-হি-হি-হি-হি

একটা পৈশাচিক হাসির শব্দ কানে যেতে লছমী চমকে ওঠে। তার পরক্ষণেই সম্বিত ফিরে এলে উঠানে নেমে যায়।

তাড়াতাড়িতে লণ্ঠন বা তেলের কুপিটাও আনতে ভুলে গেছে। তবু চারপাশের স্বল্প আলোয় আলোকিত ঘরগুলির অবস্থিতির দরুন এক নজরেই লোকটার ওপর দৃষ্টি পড়ে।

আবার হাসল লোকটা। লছমীকে দেখে নড়ল না। কতকটা আদেশের সুরে বললে—ভাত দে—

—ভাত!

—হ্যাঁ ভাত। হি-হি-হি। কদিন কিছু খাইনি।

—কিন্তু ভাত তো নেই! ছিলে কোথায় এতদিন?

—পুরনো জেলের ফাঁসিগাছে পাঁচদিন ছিলুম। আজ নেমেছি। বড় খিদে পেয়েছে, ভাত নেই?

লছমীর এখন কথা বাড়াবার মত ফুরসৎ নেই। সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হয়েছে, এবার গ্রাহকের উপদ্রব আরম্ভ হবে। তবে সেদিনকার ঘটনার পর থেকে লছমী একটা কাজের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। শিকারের আশায় অন্ধকার গলির মুখে দাঁড়িয়ে ষড় ধাতুর নির্যাতন আর ব্যর্থ প্রত্যাশার ক্ষণ গণনার প্রয়োজন হয় না। সহদেব বশীভূত হয়েছে। তার দাবিও সামান্য। লছমীর যৎ-সামান্য দানেই সে আপ্লুত হয়ে পড়ে। উপচে ওঠে যেন! তার

হাঁফধরা গলায় কৃতজ্ঞতার সুর ঘড়ঘড় করে। সন্ধ্যায় শিকার ধরে আনে। সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত, যতক্ষণ না পর্যুদস্ত লছমী প্রত্যাখ্যান করে, ততক্ষণ একের পর এক নতুন অতিথিকে সহদেব লছমীর দেহ-দেউলে উপস্থিত করে। এত লোক, এত প্রণয়ী, এত পূজারী এতদিন ছিল কোথায়, বুঝতে গিয়ে লছমী হিমসিম খায়! মাঝ রাতের পরও সহদেব লোক এনে হাজির করে—দোর খোল লছমী, দশ মিনিট বসেই চলে যাবে, বিশ টাকা দেবে। লছমী দরজা খোলে না, সাড়া দেয় না, ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে। ঘুমটা অবশ্য ভান, কিন্তু শ্রান্তি মিথ্যে নয়, অবসাদটা মিথ্যে নয়। পারিশ্রমিক আদায়ের ভারও সহদেবের ওপর। লছমী শুধু কিঞ্চিৎ বকশিসের প্রত্যাশায় গ্রাহকের কাছে হাত বাড়িয়ে দেয়। পেলে ভাল, না পেলেও ভাল। হঠাৎ প্রাপ্তির বন্যায় অর্থপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছে সে। সহদেবকে বাঁধা দরে কমিশন দেয় লছমী। সহদেব হাত পেতে নেয়ও, তারপর লছমীর ডান হাতখানা টেনে নিয়ে টাকাগুলো গুঁজে দেয়। ফেরৎ দেওয়ার সময় লছমীর হাতের তালুতে সামান্য চাপ দেয় সে। এই পর্যন্ত!

অন্ধকারাশ্রিত মানুষটিকে লছমী সংক্ষিপ্ত জবাব দিল—রাতে আমি কিছু খাই না। হেঁসেলে হয়তো খান দু'চার রুটি আর একটু পেঁপের তরকারি আছে, খাবে?

লোকটা যেন আশান্বিত হ'ল—বাঁচলুম! তারপর ক্ষিপ্র-ব্যগ্র সুরে বললে—যা আছে, তাই দে। আমার আর সময় নেই।

—কেন?

—এখুনি গিয়ে বড় ময়দানের অশ্বত্থ গাছটায় উঠতে হবে।

সাতদিন নামব না। হয়তো কাজ চুকতে ন' দিনও হয়ে যেতে পারে। বিড়ি নেই ?

—আছে।

—দিন দু' পাঁচটা ?

লছমী ঘরে ঢোকে। লণ্ঠন হাতে নিয়ে হেঁসেল হাতড়ে খান কয়েক রুটি আর কিছুটা পেঁপের তরকারি একটা শালপাতে বের করে নেয়। তারপর কুলুঙ্গি খুঁজে বিড়ি নেয় কয়েকটা। জিনিসগুলো নিয়ে ঘরের বাইরে এসে মাস্তানকে বলে—এখানে বসে খাবে, জায়গা করে দেব ?

—না, না। হি-হি-হি—

মস্তান অন্ধকারে তলিয়ে যায়। গলিতে নামতে কয়েকটি নামগোত্র বংশ-পরিচয়হীন বালক তার কাছে এগিয়ে আসে। সমস্ত খাবারটাই মাস্তান তাদের ভাগ করে দেয়। বিড়িও মাথাপিছু একটা করে দান করে। তারপর বলে—ভাগ শালারা, ভাগ—। হি-হি-হি—

একটি বালক আপত্তি জানায়—একখানা রুটিতে পেট ভরে ?

—ভরে না, আমার তো হাওয়া খেয়েই ভরে! হি-হি-হি—। দাঁড়া দেখি তবে, আর কোথায় কি পাওয়া যায়, কিন্তু তোরা এখানেই থাক, আমার পিছু নিস না।

মাস্তান আর একটা পতিতালয়ের দরজায় এসে হানা দেয়—হি-হি-হি-হি—খিদে পেয়েছে, ভাত দে—।

শুধু ভাতই নয়, পুরি কচুরি, জিলিপি মেঠাইও সেখান থেকে সংগৃহীত হ'ল। মাস্তানকে প্রচুর খাদ্যসম্ভারে বোঝাই করেও বাড়িউলীর আশ মেটে না। প্রশ্ন করে—আর কি দেব বাবা, বিড়ি নেবে না ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিড়ি নেব! হি-হি-হি—

পুরো তিন মুঠি বিড়ি এনে দিল বাড়িউলী। দিয়ে গল্প আরম্ভ করল। গল্প, অর্থাৎ নিজের দুঃখের অভিযোগ। তারই ইতিহাস।

আজ এ বাড়িতে কোন উৎসব ছিল না। ছিল গতকাল। কসাই-বাজারের যে নতুন মেয়েটা এখানে এসেছে, গতকাল তার নথ ভাঙানি ছিল। ভাঙল বীরপুর রাজের সদর নায়েবের বড় ছেলে। তাকে ফাঁসাবার চেষ্টায় তারা-বাড়িউলী ওৎ পেতে বসেছিল। বলে, নতুন কনে দেব, আনকোরা জিনিস। দেবে কোথা থেকে, তার ঘরে তো সব পড়তি-বাজারের পোকাধরা মাল! জানতে কি কারো বাকি আছে? তাছাড়া এই মালিনী-বাড়িউলীর কাছে তারা-বুড়ি লুকোবে কি, মালিনী তো তারার ঘরেই মানুষ! মানুষ হয়েছে, না ছাই হয়েছে। মানুষ করার নাম করে তারা-বাড়িউলী তাকে যে ক'বছর রেখেছিল, তার মধ্যে মালিনী তার নাড়ি-নক্ষত্র চিনে নিয়েছে। বুড়ি মাগী, ঘরের মেঝে খুঁড়ে পিতলের ঘড়ায় সোনা রুপো পুঁতছে; কার ছেরাদ্দে ঐ সোনাদানা আর পাপের টাকা লাগবে—তা জানে রাঁড়ের দেবতা কার্তিক ঠাকুর! মালিনীর এসব নেই। নথ ভাঙার দরুন কনের পাওনার ষোল আনাই সে কনের নামে নিজের কাছে গচ্ছিত রাখে। ছেলেমানুষ পেয়ে কে কবে ঠকিয়ে-ঠাকিয়ে পথে বসাবে, তখন তাকে দেখবে কে—তারা বাড়িউলীর বাপ 'পিতেমো'? আর সোনাদানাগুলো নিজের সিন্দুকে কুলুপ দিয়ে রেখে দেয়। তা কনের মঙ্গলের জন্যেই রাখে। তাই বলে তার নিত্যিদিনের শাড়ি সেমিজও তোরঙ্গে পোরে নাকি? পোড়া কপাল! তা একটু একটু করে ভার দিতে হবে তো, নয়তো সারাজীবন অলবেড়ে থেকে যাবে যে? কিন্তু এত করেও বদনামের

হাত থেকে মালিনীর রেহাই নেই, কি পাপ করে যে সে জন্মেছে! আসলে সব ঐ নিকষা বুড়ি তারা-বাড়িউলীর হিংসে। আর অনেক ওষুধ জানে তারাবুড়ি, বেশ্যেমন্তরগুলো সব শিখেছে ডাইনীটা; তাতেই যত মেয়েপুরুষকে গুণ করে রাখে। মরণ হয়না মাগীর, যমের অরুচি বলে কি 'শ্যাল'-শকুনিরও অরুচি!

মালিনী মাস্তানের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করে—সবই তোমার কিরপা ঠাকুর। সেবার পায়ে ধরে কত কান্নাকাটি করলুম, তাইতো মুখ তুলে চাইলে! আর একটুকুন কিরপা রেখ বাপ, নিজের বাপ কোন পিশেচ তা তো জানি না, তুমি আমার ধম্মোবাপ। আজকাল, ঐ যে বললুম, নতুন ছুঁড়িটুড়ি আমার বাড়ি মোটে আসে না—আবাগ-আবাগীরা আমার নিন্দে রটিয়েছে। আমি নাকি মারধোর করি, খেতে দি' না, টাকায় বারো আনা বখরা রাখি! একটাও সত্যি নয় বাবা, তুমি তো অন্তরের কথা টের পাও? কিরপাটুকু রেখ বাবা—

—হি-হি-হি—! তবে পয়সা দে চার আনা?

—দিচ্ছি, বাবা, দিচ্ছি। এই তোমার পূজো পুরো একটাকা।

—হি-হি—টাকা চাই না, চার আনা পয়সা দে।

বাড়িউলী আঁচলের খুঁট খুলে ফেরৎ টাকার পরিবর্তে একটা সিকি বের করে। মাস্তান সাগ্রহে সেটি মালিনীর হাত থেকে নিয়ে খাবারের চাঙারি সমেত অন্ধকার গলিতে নেমে পড়ে। ছেলে-গুলি মাস্তান দেখে কাছে এসে তাকে ঘিরে ধরে।

মাস্তান হাসে—হি-হি-হি—ভৌতিক হাসি হেসে বলে, আর তর সইল না, না? সব যেন দানবাড়ির কাঙাল! হি-হি-হি—

মাস্তান সদলবলে সদর রাস্তায় উঠে এল। গিয়ে দাঁড়াল একটা

তেলেভাজার দোকানের সামনে। হাতের সিকিটা দোকানীর সামনে ছুঁড়ে দিয়ে হি-হি করে খানিকটা হেসে নিল। দোকানের ভিড় আর আলোর বহরের সঙ্গে তার হাসি সামঞ্জস্য রাখতে পারল না। তবু মাস্তান আর একবার অনুরূপ হাসি, নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভৌতিক হাসি হেসে নিল।

বলল—ফুলুরি দে, গরম গরম! হি-হি-হি—

কৃতার্থ-প্রসন্ন দোকানী তাড়াতাড়ি একটা আট আনা পরিমাণ শালপাতার ঠোঁয়া তৈরি করে, তাতে প্রায় পঞ্চাশটা ফুলুরি তুলে, মাস্তানের উদ্দেশে পুজোর নৈবেদ্যর মত দু'হাতে বাড়িয়ে দিলে।

মাস্তান হাসল—হি-হি-হি,—চার আনায় এত!

লোকটি মাস্তানের কথায় অপ্রতিভ হল। কিন্তু লজ্জিত ভাবটা সামলে নিয়ে বললে—কত আর দিয়েছি, মাস্তান সাহেব? মাত্তর দুটো ফাউ!

—উঁহু—মাস্তান মাথা নাড়লে—চার আনার জিনিসে ফাউ চল্লিশটা! বলতে বলতে মাস্তান রুখে উঠল—তুলে নে সব, গুণে গুণে দে। হি-হি গুণে গুণে দে শালা পাপী!

দোকানী তবু অসম্মত হয়। অভিমানের সুরে বলে—তুমি তো আমার সেবা কখনো নিতে চাও না, সাহেব!

—সেবা, পাপীর সেবা! হি-হি—তবে দে একটা ফাউ, এর বেশি পাপ আমার সইবে না।

—না মাস্তান সাহেব, একটা কি দেওয়া যায়? দোকানী ঠোঙা থেকে একটিও কমাতে চায় না। তার বুকের ভিতরটা অজানা আশঙ্কায় গুর্‌গুর্‌ করে।

মাস্তানও জিদ ছাড়ে না। পয়সায় একটা হিসেবে চারগণ্ডা ফুলুরিতে

মাত্র একটা ফাউ নিয়ে সে সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে নিয়ে পথ চলতে আরম্ভ করে। মনসুরগঞ্জ পল্লী অতিক্রম করে চলে। মাঝে মাঝে হি-হি করে, আর পিছু ফিরে তাকায়। সেই সঙ্গে নিজের মনেই বিড়বিড় করে, সব আলো নিভে যাবে, হি-হি-হি—। সব আলো নিভে যাবে। রোশনী বুৎ যায়গা!

কৃষ্ণপক্ষের প্রথম রাত। অন্ধকারের ঘোর কালিমাখা বড় ময়দান জনমানবশূন্য। সুদীর্ঘ সুবিশাল কয়েকটা গাছ একাকীত্বের আস্ফালনে পরস্পরের সংসর্গ বাঁচিয়ে কাঠা-বিঘের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আছে।

তেমনি এক প্রাচীনতার স্পর্ধায় দীর্ঘায়ত অশ্বত্থ গাছের নিচে এসে মাস্তান দাঁড়াল। ছেলেগুলোকে বসতে বলল। পথ থেকে কয়েকটা কুকুর সঙ্গ নিয়েছিল, তারাও এদের দল ভারি করেছে। হাসতে লাগল মাস্তান। শূন্য মাঠে প্রতিধ্বনি ফিরে আসে না, তার হাসিরই একটা যেন অপর একটাকে অনুসরণ করে ছুটছে।

—খিদে পায় না বুঝি, আমাদের? অপেক্ষাকৃত বয়স্ক একটি বালক মাস্তানের করীশুণ্ডবৎ পেশল বাহুতে চাপড় মেরে বলল।

—ও হো-হো, তোদের খিদে পায়! খিদে পায়—

তাদের খিদের কথা স্মরণ করে মাস্তান তৎপর হল। সংগৃহীত এবং ক্রীত খাবারগুলো মানুষ আর কুকুরগুলোকে বিলিয়ে দিল। নিজে খেল না কিছু। এরা খেয়ে চলেছে আর মাস্তান হাসছে হি-হি করে। মাঝে-মাঝে বিড়বিড় করে কি বলছেও যেন, সেই সঙ্গে ঘনঘন আকাশের দিকে তাকিয়ে কি দেখছে। আকাশ অন্ধকার। তারাও নেই। তাদের গায়ে মেঘের আস্তরণ পড়েছে।

হঠাৎ মাস্তান ব্যগ্র হিংস্র কণ্ঠে তাড়া দিয়ে ওঠে। চিৎকার করে।

অবোধ্য ভাষায় ক্ষুধিত পশুর মতই যেন মাটিতে শৃঙ্গাঘাত করে। ভয় পেয়ে যায় ছেলেগুলি। কুকুরগুলোও একসঙ্গে ডেকে ওঠে। ভয়ে বা বিরক্তিতে। কিম্বা হয়তো কোন ভবিষ্যৎ-দুর্যোগের গন্ধ তাদের নাকে এসে লেগেছে! তবে তাদের খাওয়া শেষ হয়েছে।

—ভাগ-ভাগ শালারা। হি-হি-হি—

ভোজন পরিতুষ্ট পশু-শিশুর দল সেই হাসির তাড়না আর বীভৎস দুর্বোধ ভাষার আঘাতে নিমেষের মধ্যে মাঠ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। অপস্রিয়মান দলটাকে কিছুক্ষণ নীরবে নিরীক্ষণ করে মাস্তান। তাদের সামগ্রিক অস্তিত্ব অন্ধকারের বুকে নিঃশেষে বিলীন হয়ে গেলে মাস্তান হেসে ওঠে। নিজের মনেই বলে-হা আল্লা!

তারপর সুমুখের অশ্বথ গাছটায় বৃক্ষচারী জীবের মত দ্রুত উঠে যায়। গাছের একটা শাখা প্রশাখা, এমনকি পাতা পর্যন্ত কাঁপে না। দেহের সমস্ত ভার যেন বাতাসের কাঁধে চাপিয়ে মাস্তান নিজে ভারশূন্য হয়ে গাছটির উচ্চতর অংশে লীন হয়ে যেতে থাকে। এক-টুকরো অন্ধকারের ছায়া বিশাল অশ্বথ গাছটার দেহ লেহন করতে করতে তার শীর্ষদেশে পৌঁছে নিশ্চলতায় অবলুপ্ত হ'ল।

অন্ধকারের প্রাণস্পন্দন গভীর রাতের মাতৃজঠরে আরো দ্রুতলয়ে ধ্বনিত হ'ল। অশ্বথ গাছের শীর্ষ প্রশাখাটাও সেই সঙ্গে নড়ে উঠল। মাস্তান নিজস্ব হাসির শব্দে সাড়া দেয়। হাসে হি-হি-করে।

গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে কে যেন আবার ডাকে—মাস্তান!

হি-হি-হি—। জবাবে শুধু বিকট হাসিটাই শোনা যায়।

—মাস্তান, ম্যায় হুঁ শের।

—হি-হি—

বিনীত কণ্ঠস্বর—মাস্তান আজ তুম মহল্লেমে আয়ে, আউর হমসে

মিলে তক্ ভী নঁহী। তুম মুঝসে আঠ আনা পয়সে মাংগাথা ন, মাস্তান ? উস দিন মেরে পাশ কুছ ভী-নঁহী-থা। আজ হম পয়সে লায়ে হেঁ।—হি-হি-হি—

—মাস্তান পয়সে—

—লুটাদে। লুটাদে পয়েসে কো। লুটাদে অপনেকো। মুঝে কুছ নঁহী চাহিয়ে। তু'ভী কুছ নঁহী লে।

পুনরায় অনুরোধ করে শের। শেষ বার। আন্তরিক অনুরোধ আর সকরুণ মিনতি কণ্ঠের কানায়-কানায় উপচে দিয়ে বলে— মাস্তান, পয়সে—

উত্তর পাওয়া যায় না। পয়সা নিতে সম্মত হয় না মাস্তান। আধুলিটা হাতে নিয়ে কেমন যেন উদাসীন হয়ে পড়ল শের। দিন-দশেক আগে মাস্তান হি-হি করে হাসতে হাসতে আট আনা পয়সা চেয়েছিল, দিতে পারে নি শের। আগামী সাক্ষাতে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে। শুনে মাস্তান হেসেছিল। নেতিবাচক ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়েছিল বৃক্ষচারী ক্ষ্যাপা সাধক। বলেছিল—হি-হি-হি, দেনেকা মৌকা হামেসে নঁহী আতে হেঁ। দেবার সুযোগ বার বার আসে না। এ এক অমঙ্গলের সূচনা। মাস্তানের যাচ্ঞা ব্যর্থ হওয়া অথবা তার প্রত্যাখ্যান, দুই-ই এক অদৃশ্য ভাগ্যতন্ত্রীতে অমোঘ দুঃসময়ের হস্তক্ষেপ।

যাক, যা হবার তা হবেই, ভেবে লাভ নেই কিছু। তগদীরে চাদ্দরকা রফু কভী হোতি নঁহী। ভাগ্যের চাদরের ছিন্নাংশ কখনো মেরামত হয় না। শের নিজেকে সান্ত্বনা দেয়।

হাসে। যেন মাস্তানের অর্থহীন হাসির অনুপ্রাস ধার নিয়েছে সে। মস্করা করে নিজের ভবিষ্যৎকে। দীনদুনিয়ার মালিক অন্ধ নয়।

তার 'ঠেস্' আছে। শেরের মত একটি মূল্যবান মোহর আল্লামিঞা কোনমতেই হেলাফেলায় নষ্ট করবে না। অবশ্যই বেহেস্তের ইস্‌টেট্ ব্যাংকে নিজের নামের পাশবহিতে জমা করে রাখবে।

শুধু তাই নয়, শের প্রায়ই অনুভব করে, এ দুনিয়ার সে কেউ নয়। এখানে তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অবান্তর। ঈদের একফালি চাঁদের মত জনশ্রুতিতেই তার অস্তিত্ব। তার মানসিক-সত্তার একটা ছিটে-ফোঁটাও দুনিয়ার মাটিতে নেই। যেন বেহেস্ত থেকে রিটার্ণ টিকিস কেটে সে জিন্দগীর রেলগাড়ি চেপে দুনিয়ার টিশনে সফর করতে এসেছে। টিকিসের মেয়াদ ফুরোলেই যথাস্থানে ফিরে যাবে। আর ভালও লাগে না বাঁচতে। দুনিয়া দেখতে বেরিয়ে শুধু আবর্জনার স্তূপই দেখা হল। দেখল ভীরু মৃত্যুর ছায়াকীটে চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। এর মাঝে অধিকদিন টিঁকে থাকার চেয়ে একটা চূড়ান্ত ফয়াশলা হয়ে যাওয়া ভাল। দুনিয়ার মাটিতে পার্ট টাইম নোকরী যা হবার তা হল। গোটা বত্রিশেক খুন। উপরন্ত শ' দু-আড়াই রাহাজানী, গোটা পঞ্চাশেক ডাকাতি। এর পরও যে সে বেঁচে আছে তাই আশ্চর্য। এবার সে হুরী-পরীর বেলোয়ারী ঝাড় সাজানো বেহেস্তের মজলিশে ফিরে গিয়ে শায়েরের সার্ভিস নেবে। রাত্রিদিন খুদামিঞার মেহেরবানীর পয়গম গাইবে। দুনিয়ার চেরাগে জিন্দগীর তেল ফুরিয়ে যাবে, তামাম দুনিয়া মৃত্যুর ঠাণ্ডা কফ্‌ফন্ মুড়ে ঘুমিয়ে থাকবে; আর শের তার কানে সুরের হাকিমী দাওয়াই ছিটিয়ে পুনর্জীবন দানের চেষ্টা করবে। কিন্তু চেষ্টা করবে দূর থেকে, বেহেস্তের মজলিসে বসে—আর ফিরবে না এখানে। খুদা হাফিজ্।

অনিশ্চিতের বিড়ম্বনায় সারা মনসুরগঞ্জপল্লী হতবাক হয়ে গেল। নৈশবিলাসের সব আয়োজন রাতারাতি উধাও হয়ে গেছে। সন্ধ্যা-রাত্রির পর এ অঞ্চলে পদার্পণ করে পরিচিতের অন্তরাত্মা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। বিকৃত রুচির ঐতিহাসিক আভিজাত্য আজ নিষ্প্রদীপ পল্লীর বর্ণমালায় পাণ্ডুর অপাঠ্য অক্ষরের শব্দসমষ্টির মত বোধ হচ্ছে।

সাঁইত্রিশটা পানের দোকানের চৌত্রিশটা বাতি নিভিয়েছে। গন্নুও তার দোকান তুলে দিতে চেয়েছিল। শেরের আপত্তিতে তার সঙ্কল্পের জোয়ারে আপাতত একটা কাঁচা অনিচ্ছার এবং দ্বিধার বাঁধ দিয়ে রেখেছে।

বলেছে—আর বেশিদিন তোর কথা কিন্তু রাখতে পারব না শের। খাব কি? বউ ছেলেপিলেদেরই বা চলবে কিসে? সবই তো আটফিট বাই পাঁচফিট মিউনিসিপ্যাল ড্রেনের প্ল্যাটফরমের ভরসাতে ছিল। অবিশ্যি ট্যাক্স আর তেমন কি? বছরে ছ' আনা স্কোয়ার ফুট। কিন্তু দোকানের চৌকাঠে নাক রগড়ে পড়ে থাকলে তো আর পেট ভরবে না?

গন্নুর দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও শের কোন কঠিন গবেষণায় গেল না। নিজের বিশৃঙ্খল জীবনের ধারাপাতে সে জীবন ধারণের উপযোগী বহু পন্থাই খুঁজে পায়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অপরকে পথের সন্ধানও দেয়। স্বচ্ছন্দ বিলাসিতায় বিলায়তী সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে ভয়ঙ্কর প্রতিশ্রুতি সে কত দিয়েছে এবং তা রক্ষাও করেছে, তার হিসেব কষতে গেলে কয়েক শ' পৃষ্ঠার এক কিতাবই লেখা হয়ে যেতে পারে। সে কিতাবের প্রতি পৃষ্ঠায় রক্ত-স্বাক্ষর। প্রতি পংক্তিতে বিভীষিকা। প্রতি শব্দে বিপুল ভীতি। আর প্রতি অক্ষরে আশঙ্কা।

অপরে যা কিছু ভাবুক না কেন, শের কিন্তু মনে করে জিন্দগীর রাস্তা পালতোলা নৌকোর যাত্রাপথের মত সহজ। অবাধ নিয়তির দরিয়ায় গা ভাসিয়ে দিয়ে বে-ফিক্র বসে থাকলেও কিন্তু যেখানে ভেড়বার ঠিক সেখানেই ভিড়বে।

সেই ভরসাতেই শের আশ্বাস দেয়, গন্নু্র পিঠে বরাভয়ের চপেটাঘাত করে বলে—হাত আছে, পা আছে, মাথার খোপড়িতে মগজ আছে—তবে এত চিন্তা কিসের তোর? কিসের ফিক্র…দে একটা সিগরেট, ভাল বিলায়তী দে।

গন্নু্ চিন্তিত মুখেই শেরের কথার জবাব দেয়—বেশি দামের সিগরেট নেই, খাবে কে? কে কিনবে! ভদ্দরলোকেরা কি আর এ পাড়ায় তেমন আসে? এক পয়সা দামের আছে, খাস তো নে?

—পয়সিয়াল সিগ্রেট—শের ঘৃণায় ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে—পয়সিয়াল সিগ্রেট খাব, আমি কি সরকারী অপিসের কিলার্ক! মহল্লায় দুটো বাতি নিভেছে, সেই দুঃখে ধূনো-লোবানের বদলে ঘুঁটে পোড়াব? সিগ্রেটের ধোঁয়া যায় দিল-এর মসজিদ পর্যন্ত—বাইরের দুনিয়ায় একটু গরীবীর ছোঁয়া লেগেছে কি না-লেগেছে, অমনি আল্লার ইজলাসে আতর গুলাবের বদলে সাদা পানি ছিটিয়ে দেব! তাওবা—

অতিরিক্ত তাওবা শব্দটি প্রয়োগে শের তার বক্তব্যের পাদপূরণ করার পর গন্নু্ বিরক্তির ঝাপটা দিয়ে বলে—থাম থাম, হয়েছে! তোর ঐ বড় বড় বাৎ দিয়ে কোরানের বয়েত্ লিখিস, আর জুম্মার দিনে ফকিরকে ভিক্ষে দেবার সময় মসজিদের দোরগোড়ায় বসে এক এক মুঠো জনারের সঙ্গে এক একটা বয়েত্ বিলিয়ে দিস। সাত্যকারের দানাপানি কিসে জুটবে, তাই আমায় বল? ভিক্ষে না করে,

চুরি না করে, ছেলেমেয়ে বউ-এর ভাত কাপড় কিসে জুটবে, তাই বল!

গন্নুর বিরক্তি আর অবজ্ঞায় খানিকটা নিরুৎসাহ হলেও শের পশ্চাৎপদ হল না, বললে—তাই তো বলছিলুম। আল্লার নাম কর, তামাম দুনিয়ার আকতাব মেহতাবের (সূর্য চন্দ্রের) বাদশাকে ডাক, সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু হোঁসিয়ার—

সুমুখের কোন আততায়ী দেখিয়ে শের যেন গন্নুকে সাবধান করে দেয়—কিন্তু হোঁসিয়ার! বাদশার মেহরবাণী পেতে হলে মনেপ্রাণে তোকেও বাদশা হতে হবে। বাদশারা আবার বড় অভিমানী কিনা! বলে, আমার রাজ্যে কোন গরীব নেই, এ বেটা নিশ্চয়ই অন্য কোন রাজ্যের প্রজা। এ বেটা গরীবের জন্যে আমি কেন মাথা ঘামাব?

শের হেসে ফেলে। অগত্যা হাসতে গিয়ে গন্নুও হেসে ওঠে, বলে—সত্যি আল্লা খুদা ভগবান আছে কি নেই, জানি না। রাজা বাদশা চোখে দেখিনি, মিডিল স্কুলের ইতিহাসেই পড়েছি; কিন্তু তোকে দেখে মনে হয়, যেন তুই এক বাদশা। কথার বাদশা। শুধু কথা আর কথা, অথচ এখনো পর্যন্ত কাজের কথা একটাও হল না!

—কাজের কথা! শের যেন আকাশ থেকে পড়ে—কাজের কথাই তো বরাবর বলছি, কান পেতে কখনো শুনেছিস তুই, কেউ কোনদিন শুনেছে? কোন সকালে উঠে পূরব আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছিস? পূরব আকাশের সূর্যের সঙ্গে তোর চোখজোড়া কোনদিন পশ্চিম আকাশের কোণ পর্যন্ত ঘুরিয়ে নিয়ে দেখেছিস? ঐ একটাই কাজের কথা, পূরব আকাশে যে আলো, পশ্চিম আকাশে সে-ই অন্ধকার। জিন্দগী আর মৌৎ। পয়দা যখন হয়েছিস তখন

একদিন না একদিন চিতেয় তোকে উঠতে হবে। যে গন্নু আজ মানুষ সেজে বিবি বাচ্চার বোঝা টানছে, তাদের জিন্দগীর খোরাক জোগাচ্ছে, সেই গন্নুই একদিন লাশ সেজে রিস্তেদার আর দোস্ত-ইয়ারের বোঝা হয়ে কাঁচা বাঁশের নাগরদোলায় চেপে বিনটিকিসে শ্মশানের টিশনে গিয়ে টিরেন ধরবে। এটাই শুধু কাজের কথা। বাদবাকি যা বলছিস তা কাজের কথা নয়, বাজে কাজের কথা। তামাশার কথা। দিল্লগীর কথা। ওগুলো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দে। আর যা প্রাণ চায় তাই করে যা, বাহাল তবীয়তে থাক। শুধু কারো দিল-এ চোট দিস না। যারা তোর কাছে উমেদ নিয়ে আসে, তাদের নিরাশ করিস না। তুই যে ইনশান! গিরগিটি তো নয়?

শেরের আন্দোলিত ওষ্ঠদ্বয়ের দিকে গন্নুর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু তার কথায় কান ছিল না। অজ্ঞাত অন্যমনস্কতার সঙ্গে সে কখন একটা সস্তাদামের সিগারেটের প্যাকেট খুলে একটি সিগারেট বের করে দুই আঙুলের মাঝে ঘোরাচ্ছিল, তা বুঝতে পারে নি।

শেরের কথা শেষ হলে গন্নু খানিকটা ম্লান হাসির ঝিলিকে গুম্ফপ্রান্ত ঈষৎ কাঁপিয়ে সিগারেটটি শেরের দিকে বাড়িয়ে দিল—নে, দোকানে পড়ে থেকে তো পচে যাবে, তার চেয়ে দু'দম টেনে নিয়ে ফেলে দে? দিল-এর মসজিদ পর্যন্ত ধোঁয়া নাই বা টানলি?

—দিবি দে—শের হাত বাড়িয়ে দিলে—হারামের খানাপিনায় এত বাছবিচার চলে না; কিন্তু সত্যি বলছি, এ সিগ্রেটে একটা দম টানলেই আমার খাঁশি হয়।

সস্তার সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে শের সস্তার পৃথিবীতে নেমে আসে—এত তুই ভাবছিস কেন, তোর একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। তারপর নিমেষের জন্য চোখদুটি বন্ধ করে কি যেন ভেবে নিয়ে

বললে—ছোটখাট একটা বিড়ির কারখানা খুলবি, বা একটা মুদিখানা ?

—পুঁজি ?

—আমি দেব হাজার টাকা। মল্লিকবাবু বলেছিল, যদি কোন কারবার করতে চাও তো পুঁজি দেব।

—তবে তুই করিস না কেন ?

—দেখ গন্নু,—শের নিজস্ব ভঙ্গির নিস্পৃহতার সঙ্গে বললে—কারবার মানে হিসেব, আর এটাই আমার দ্বারা হয় না। গজ মিটার দিয়ে কাপড় মাপা, সের কিলো দিয়ে আনাজ মাপা, এ আমার ধাতে পোষায় না। আমার মনে হয়, আল্লা যখন আমাদের মেপে-মেপে পাঠায় নি, আমাদের জিন্দগীর আর মৌৎ-এর হিসেব রাখে না ; যখন যাকে খুশি পাঠাচ্ছে আর যাকে খুশি টেনে নিচ্ছে—তখন আমি কেন হিসেব মেনে চলি। আমি আল্লার মতই বে-ফিক্‌র। আজাদ। আমি খুশির চানা চিবিয়ে দিন কাটাব, কিন্তু হিসেব-করা মেপে-বাঁধা মোতিচুর খাব না।...তা তুই কারবার করতে চাস তো বল ?

—পুঁজি পেলেই—

—কত চাস ?

—যতটা তুই দিতে পারিস।

—মল্লিকবাবু আমায় হাজার টাকা ওয়াদা করেছে, তোকে দেব ন'-শ'। আর আমি শ' টাকার এক বোতল বিলায়তী সরাব ঢালব।

গন্নু কতকটা উৎফুল্ল হয়ে বললে—বেশ, তুই তাহলে ন'শ-ই দিস হাঁরে, সিগ্রেটটা একেবারে খারাপ হয়ে যায় নি তো ?

—পয়সিয়াল সিগ্রেটে কি টোব্যাকো থাকে, যে খারাপ হয়ে যাবে? এসব সিগ্রেট কাঠের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি করে, একদম ফ্লেভার থাকে না।···হ্যাঁ কি যেন বলছিলুম! ও হ্যাঁ, ন'শ টাকাই তোকে দেব, কিন্তু—শের কিঞ্চিৎ বিরতি দিয়ে বলে—তুই ওয়াদা কর, পুরো হাজার টাকা মল্লিকবাবুকে ফিরিয়ে দিবি?

মুহূর্ত কয়েক ভেবে নিয়ে গন্নু সম্মত হয়—তা তো দিতেই হবে, কালির দিব্যি।

—বেশ, তাহলে কাল টাকা আনব। সিগাবেটে একটা টান দিয়ে শের দেখল সামান্য অমনোযোগের ফলে সেটি নিভে গেছে। আবার একটা বৃথা টান দিয়ে সেটাকে গন্নুর দোকানের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—নে শালা, তোর জিনিস আপস নে, শালা বেহুদা, উল্লু—

গন্নুর মুখে একটা নিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রশান্তি-চিহ্ন ফুটে উঠেছে—শেরের আধপোড়া সিগারেটের টুকোরটা কুড়িয়ে নিয়ে সে তাতে পবম আগ্রহে অগ্নিসংযোগ করল। তারপর একটা আরামের ধূম্রকুণ্ডলী প্রায়ান্ধকার সরকারী রাস্তার দিকে উদ্গীরণ করে কি একটা বলতে গেল সে। হয়তো কৃতজ্ঞ ভাষায় শেরের মহামহিমতা সম্বন্ধে ছোটখাট বিবৃতি দেবারই চেষ্টা করছিল, কিন্তু ততক্ষণে শের দ্রুতপায়ে খানিকটা পথ চলে গেছে।

বুড়োনাথের গলির মসজিদ থেকে সান্ধ্য আজান সন্ধ্যার ভারি বাতাসে বেশ ঘনীভূত হয়ে তার কানে প্রবেশ করেছে।

নামাজ শেষে শের মসজিদের প্রবেশ পথে ড্রেনের পাকা কালভার্টের ওপর সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে পড়ল। মনে হচ্ছে হাতে যেন কোন কাজ নেই। সরকারবাহাদুর মনসুরগঞ্জ-পল্লীর অপরিশুদ্ধ

আবহাওয়া বিশুদ্ধিকরণে তৎপর হয়েছে। কলঙ্কের স্পষ্ট অক্ষরে স্বাক্ষরিত খোলাবাজারের খানিকটা অংশ আইনের পরিমার্জনায় নেপথ্যের অন্ধকারে চলে গেছে। গায়ক-গায়িকা সঙ্ঘের সাইনবোর্ড এঁটেছে কয়েকটা বাড়ির গুটিকয়েক কুঠলি। সুরা সুর আর সারেঙ্গীর অন্তরালে আইনের দৃষ্টি বাঁচিয়ে যেটুকু চর্মোৎসব হয়, তাতে এদের বাজার চলে না। পেট চলে না। এতদিনের বর্ণঘন বিলাসিতা আজ যেন পলতেপোড়া কেরাসিন বাতির ধোঁয়াটে আলোর মত টিমটিম্ করছে।

কয়েক ঘণ্টা সময় কি করে কেটে গেছে, শের টের পায় নি। একটা বড় রকমের হাতসাফাইর ক্ষুদ্র নিদর্শন স্বরূপ ছোট্ট ট্যাঁক-ঘড়িটা পরিধেয়ের ভাঁজ থেকে বের করে শের তীব্র দৃষ্টি মেলে সময় দেখে নিল। রাত সওয়া দশ!

—ছ্যৎ তেরী, টাইমকা এ্যয়সি কা ত্যায়সি—একটা বিরক্তি সূচক স্বগতোক্তি করে শের উঠে পড়ল। অন্যমনস্কতার দড়ি বাঁধা পায়ে টান পডল যেন! শের রাস্তায় এসে দাঁড়াল—গলির রাস্তা ছাড়িয়ে নতুন আইনের লাল দাঁড়ি টানা মনসুরগঞ্জের আসল বাজার এলাকায় চলে এল সে।

বড় রাস্তায় উঠে শেরের সর্বস্নায়ু সজাগ হয়ে ওঠে। অথচ তার করণীয় কিছু নেই। পুলিসের লাল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গায়ক-গায়িকা সঙ্ঘে সভ্যাগোষ্ঠী বহির্ভূত কয়েকটি শিকার ধরা পড়েছে।

পুলিসের আবেষ্টনে আসন্ন নির্যাতনের সম্ভাবনামূলক ভীতিপূর্ণ উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও সীতিয়া শেরকে দেখতে পেয়ে ডাক দিল—শের—

শের মৃদু হেসে সীতিয়ার কাছে এগিয়ে গেল—ধরা পড়েছিস! আর কে কে আছে?

সীতিয়া মৃদু হাসল, তারপর যেন উপস্থিত সকলকে শুনিয়ে বললে—হাতে কিছু নেই, জাল কাটতে পারলুম না। তাছাড়া—সীতিয়া কথাটা অসমাপ্ত রেখে দিলে।

—তাছাড়া কি?

সীতিয়া মুখ টিপে হাসল, তারপর এ. এস. আইর দিকে তাকিয়ে বললে—তাছাড়া এঁরা বহুদিন হল দেশ থেকে এসেছেন, দেহমন ব'লে একটা জিনিস তো আছে!

তার কথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুমান এবং ইঙ্গিতে বুঝে নিয়ে পুলিসের লোকটি সীতিয়ার বাহু ধরে নির্মম ভাবে আকর্ষণ করলে—তারপর অশ্লীল একটি উক্তি করে বলল—উল্লুকী বাচ্চীকা ডর নঁহী হ্যায়। উঁচি বাত বোলগী তো মারে হাণ্টার দেহ্ ফাড় দেঙ্গে। —তারপর অশ্রাব্য গালাগালও দিলে খানিকটা।

অশ্রাব্য বাক্যটা সীতিয়ার চির-অভ্যস্ত কানে প্রবেশ করল বলে মনে হয় না। এ. এস. আইর কথার উত্তর সে যে ভাষায় ব্যক্ত করল তা বিশুদ্ধ ব্যাকরণ সম্মত হলেও লেখনী সিদ্ধ নয়; শেষে বললে—ডর আমার না তোমার? আমার মুখ দিয়ে খুন ওঠে তা জানো?

—অ্যাঁ!

—হাঁ, সীতিয়া গম্ভীর স্বরে বললে—কানুনের লাঠিতে আমায় শাসন কর তো বেঁচে যাবে, তা না করে যদি আমার গায়ে সোহাগের হাত বোলাবার চেষ্টা করেছ, তো প্রথম কদম টি. বি. হাসপাতাল, আর দ্বিতীয় কদম—

সীতিয়া এক মুহূর্ত নীরব থেকে প্রশ্ন করলে—কি জাত তোমরা ?

—মুসলমান। পেশোয়ারী—

—তবে ঐ যে—শেরের দিকে আঙুল দেখাল সীতিয়া—ও একদিন যেখানে যাবে, সেখানে। তাতারপুরে নবাব সাহেবের গোরস্থান, সেই যে গো, যেখানে পুরনো আমলের নবাব-উজীরেরর গোর আছে ?

—চল্ খানকী মাগী—অন্য একজন কনস্টেবল সীতিয়াকে লাল গাড়ির দরজার দিকে টেনে নিয়ে গেল।

সীতিয়া লালগাড়িতে উঠল। তার সঙ্গে আরো কয়েকটি। মাস কয়েকের মধ্যেই এরা বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে। একটা রাত্রিবৈচিত্র। একটা দিবা-প্রহসন। তারপর প্রত্যাবর্তন এবং চিরাচরিত পাশবিক জীবনে আত্মবিলোপন।

রাস্তার আলো গাড়ির জাল ভেদ করে কতকটা ভেতরেও এসে পড়েছে। সেই অল্প আলোয় শের একবার ছাপ-মারা মেয়েগুলির মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। দু-একটা অচেনা স্তিমিত মুখ। কয়েকটি পরিচিত। লছমী এ দলে নেই।

নতুন আইনের বর্গী হামলায় লছমী একদিনও ধরা পড়ে নি। বরং তার ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে। আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে শিকার ধরতে হয় না। সহদেবের সহযোগিতা তাকে এক ধাপ উঁচুতে তুলেছে। অনিশ্চিত আর অব্যবস্থিত বাজারে লছমী নিজের দরও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। দু'পাঁচ টাকা চোখ ফিরিয়ে দেখে না। তার মুখের হাসি জড়ানো দেহ তরঙ্গে সাময়িক অবগাহনের দক্ষিণা কমপক্ষে একখানি দশটাকার নোট। এতেও সে অনেক সময় বিরক্তিতে উন্নাসিকা হয়ে থাকে।

শোভনাল্লা! লছমীর কথা শের সম্পূর্ণ ভুলেই গিয়েছিল। তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও বন্ধ হয়ে গেছে।

—একবার অন্ততঃ চল ওস্তাদ—সহদেব অনুরোধ করেছে। শের কোন জবাব দেয় নি। অন্যমনে, হয় সে ট্যাঁকঘড়ি কিম্বা কোমরের ছোরাখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে।

—যাবে না! এবার সহদেব অনুনয় করে।

—নঁহী। তারপর শের নিজের অজ্ঞাতেই বলে ফেলে—তোর লছমীর তো আজকাল দিন ফিরেছে!

শেরের কথার ঈর্ষাকাতর সুরটা সহদেবের কানে ধরা পড়ে। সে অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করে। হাসিও পায় একটু। মানুষ অনেক দেখেছে সহদেব। সকল রিপুর সংমিশ্রণ—ভয় ঈর্ষা লোভ দীনতা-বোধ নীচতা, সব কিছুরই পরিচয় সে সকলকার মধ্যে পেয়েছে। কিন্তু শেরের মধ্যে অনুরূপ কোন বিকারের দর্শন পায় নি। সহদেব শেরকে বহুদিন থেকে দেখছে, কিন্তু লছমীর পরিপ্রেক্ষিতে এবং তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দেখে নি কোনদিন।

শেরও সহদেবকে লছমীর পরিপ্রেক্ষিতে দেখে নি কোনদিন। সহদেব সাফ জবাব দিল—এ কথা তোমার মুখেই মানায় ওস্তাদ! কিন্তু লছমীর দিন ফিরছে না, তার দিন ফুরিয়ে আসছে। ও আর বেশিদিন বাঁচবে না। তোমাকেও ভুগতে হবে না।

—কি হয়েছে তার? শের আবার ঘড়ি দেখে। কোমরের ছোরাখানার অস্তিত্ব হাল্কা হাতের স্পর্শে অনুভব করে। আবার বলে—জিন্দগীর ঘড়ির চাবি বুঝি ফুরিয়ে গেছে?

—বিমারী। ডাক্তার বলেছে, এর ইলাজ নেই।—সহদেব কিছুক্ষণ

নীরব থেকে আবার বলে—আমি তো দেখি ওর শরীরের হাড্ডি কখানা চলতে ফিরতেও খট্‌খট্‌ করে বাজে!

—বিশমিল্লা! শের খানিকটা হাসবার চেষ্টা করে। একটু বাঁকা হাসি মুখে নিয়ে বলে—মাটির লছমী এখন সোনার লছমী হয়েছে, তার 'ফীস' দশ-বিশ টাকা! আজকাল লছমী-বিবি বিলাক মার্কিট শুরু করেছে! বলতে বলতে শের আসল প্রসঙ্গে ফিরে এসে মন্তব্য করে—কি বলছিলি যেন, বাঁচবে না বেশিদিন? ভালই তো দুনিয়ার গন্দগী থোড়া বহুত সাফ হয়ে যাবে।

—তুমি কি সত্যি কথা বলছ ওস্তাদ! সহদেব বিশ্বাস করতে পারে না। আন্তরিক অবিশ্বাসের চাপে তার দু'পাটি দাঁত দুর্বল হাসির ফাঁকে প্রকটিত হয়ে পড়ে।

—সত্যি বলছি না তো কি ঝুট বলছি? শের জোরে জোরে ঘাড় নাড়ে—ও বেঁচে থেকে কি করবে? কিছু ইনসানকে বিমারীতে ডোবাবে। দু-চারটে ভালা খান্‌দান আগুনে পোড়াবে। তারপর নিজে মরে যাবে। এর চেয়ে সে যত জলদি ফিনিশ হয়, ততই ভাল।

সহদেব তবু চেষ্টা করে—তাহলে একবার দেখা করে এই কথাটা বলে এস?

—কোন কথা?

—বলে এস, তুই যত তাড়াতাড়ি ফিনিশ হয়ে যাস, ততই ভাল?

শের যেন আকাশ থেকে পড়ে—এ কথা বলার জন্যে আমি!

—আর কে বলবে?

—কেন লছমীর আঙনায় কি কৌয়া ডাকে না?

—ডাকবে না কেন!

—কৌয়ার ভাষা বোঝে না লছমী? শের ছটাক খানেক পানের পিক্ ঢেলে সরকারী রাস্তার কালো পিচ রাঙিয়ে দেয়—দাঁড় কৌয়া বলে, কা-আ-আ—, মশান মে চলি আ। আয় লছমী শ্মশানে আয়। রাত্তিরবেলা ঘড়ি-ঘড়ি গীধড় ডাকে, হু-আ-আ—। তারা তো দিনরাত্তির লছমীকে আয়-আয় করছে, তবু শালী মরে না কেন? রিটার্ণ টিকিট কেটে তো এক নরক থেকে এই নরকে বেড়াতে এসেছিল, অনেকদিন হয়েও গেল; তবু ফিরে যায় না কেন? টিকিট হারিয়ে ফেলেছে, না রাস্তা ভুলে গেছে? যদি তাই হয়, তো আমায় বল—

শের খপ করে ছোরাখানা টেনে বের করে, কিন্তু পরক্ষণেই বলে—আফসোস, শালী আওরাৎ হয়ে পায়দা হয়েছে; আমার ছুরা বড় সরিফ, আওরাতের বুক ছুঁতে নাফরাৎ করে।

লালগাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে। রসুল দারোগা গাড়িতে ওঠবার সময় শেরের সঙ্গে তার দৃষ্টিবিনিময় হয়ে গেল।

শের নিজের অজ্ঞাতেই ডেকে ফেলল—রসুল!

ডাকটা কি রসুলের কানে প্রবেশ করেছিল, স্টার্ট নেওয়ার শব্দে হয়তো প্রবেশ করে নি। শুনতে পেলে রসুল হয়তো গাড়ি থামাত। হয়তো নয়—অবশ্যই। নিঃসন্দেহে!

নিজের চিন্তায় শের সংক্ষিপ্ত হবার চেষ্টা করে। জীবনের প্রথম বিপর্যয়। ভবিষ্যৎ জীবন-পর্বের প্রথম পৃষ্ঠা।

কত সহজে, যেন অভ্যস্ত আবেগেই, রসুলের কলিজা ফুঁড়ে দিয়েছিল শের। অথচ তখন এ ছোরাখানা তার সম্বল হয় নি। অবলম্বন হয় নি। আব্বাজানের, শৌখিন সংগ্রহের অন্যতম সংগ্রহ

গুপ্তির কিরিচ সে সহোদরের বুকে আমূল বিঁধিয়ে দিয়েছিল। ঝগড়া করে নয়। বিদ্বেষবশতঃ নয়। শুধু একটু কৌতূহল। বাস্তবিকই এই শৌখিন গুপ্তির কিরিচ বিঁধে মানুষ মারা যায় কিনা! এই ফিন্‌ফিনে লোহার ছড়িটা সুঠাম দেহের অন্তরীণ হয়ে, অস্থি-উপলের প্রতিরোধ ভাঙতে সক্ষম কিনা? হ্যাঁ, সক্ষম! শের নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাই পরখ করে দেখেছিল। রসুলের হত-বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখদুটি কেমন ধীরে ধীরে মুদিত হল, শেরের তা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। তারপর মৃত মানুষটির বুক থেকে সন্তর্পণ সমাদরে কিরিচটি তুলে নিয়ে, গুপ্তিটা আব্বাজানের যত্ন-লালিত ঐশ্বর্যের সঙ্গে যথাপূর্ব রক্ষা করে, ঘরের দরজায় শিকল তুলে, মুখে বিড়ি ধরিয়ে স্টেশনের পথ ধরেছিল সে। এবং পরবর্তী জীবনে এই ঘটনাটিকে বাস্তব জীবনের পূর্বকথার মত ছেলেমানুষীর নেপথ্য-লোকে ঠেলে দিয়েছিল।

সেই শেষ। অতঃপর শের আর কোনদিন ছেলেখেলা করে নি। বিশ বছর বয়েস পূর্ণ হবার আগেই বিশপর্দা গাম্ভীর্যের আস্তরণে সর্বাঙ্গ মুড়ে ফেলেছিল। রসুলের স্মৃতিও সেই সঙ্গে অবলুপ্ত করে দিয়েছিল।

লালগাড়ি চলে গেছে। শের একবার ঘড়ি বের করে সময় দেখে নিল। মাত্র পৌনে এগারোটা! রাস্তার ও-পারে দু'তলা বাড়ির ওপর তলায় একটা ঘরে পূর্ণমাত্রায় তবলা-সারেঙ্গীর জোয়ার ছুটেছে। গায়ক-গায়িকা সঙ্ঘের অন্যতম সভ্য শাওনীবাঈ-র ঘর। রাস্তা থেকেই দু'তলার বারান্দার রেলিং-এর গায়ে ঝোলানো টিনের বোর্ড

নজরে পড়ে। হলুদবর্ণ মেঝেয় কালো অক্ষরে লেখা—গায়ক গায়িকা সঙ্ঘ। গায়িকা শাওনীবাঈ সুলতানী।

শের অধরোষ্ঠ পেষণ করে—শাওনী বাঈ, না শয়তান-বাঈ!

তারপর সে কি মনে করে ওপরতলায় উঠে যায়। বিনা জিজ্ঞাসাবাদেই দারজার সাটিন-পর্দা ঠেলে ঘরে ঢোকে। শেরের আচম্বিত উপস্থিতির তরঙ্গাঘাতে শাওনী-বাঈ-র গান থেমে যায়। ঠুংরী কি গজল, অথবা মিশ্র কোন একটা সুরের সারেঙ্গীও সেই সঙ্গে স্তব্ধ হয়। তবলার শেষ চাঁটির শব্দ তখনো কাঁপছে।

শাওনীবাঈ চমকে উঠল—! তবু সম্ভাষণ জানালে শেরকে—সালাম—

—আলায়কুম—। ঈষৎ ঘাড় নত করলে শের। সৌজন্য প্রদর্শনের বদঅভ্যাস বশতঃই সামান্য শিষ্টাচার দেখিয়ে ফেলল।

—হুকুম ফরমাইয়ে?

শ্রোতৃবর্গ ভীতিময় অস্বস্তি নিয়ে পান চিবুচ্ছে। কয়েকটি শূন্য অর্ধশূন্য কাঁচের গেলাস আর দেশী-ভাঁটির বিলেতী লেবেল আঁটা বোতল ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। আর মেঘমণ্ডলের মাঝে পাণ্ডুর চন্দ্রবিন্দুর মত বসে আছে শাওনীবাঈ।

শের বিনা আড়ম্বরে, বাজে কথার হাত এড়িয়ে, হুকুম ফরমাশ করল—পচাশ রূপায়ে দেও?

তসতরি থেকে 'আংরেজী সিগ্রেটের' প্যাকেট তুলে একটা সিগারেট ধরাল শের। তারপর একমুখ ধোঁয়া উগলে দিয়ে আবার বললে—টাইম বহুত কম হ্যায়, জলদি লাও পচাশ; দেরি হোনে পর আউর পচাশ রূপয়ে জুরমানা।

বিরক্তি আর অপমানের চাপা আঁচে শাওনীবাঈ-র রং-করা মুখের

চামড়া কুঞ্চিত হল। সুর্মাটানা আধবোজা চোখ ছুটি ঘৃণার ভঙ্গিতে ফুটে উঠল এবং তাদের বিসদৃশ গোলাকার রূপ নিস্ফল আক্রোশে ঝলসে উঠল।

শের ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলে। কি বিশ্রী দেখতে মেয়েটা, বদসুরৎ চুড়েল একটি! তাওবা—। উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের কুরুচির পরিচয়ে শের মর্মাহত হল। লজ্জা যেন তারই। এই গিরগিগটিগুলো তার স্বজাতি—পুরুষ মানুষ!

শাওনীবাঈ-র কুৎসিত চোখছুটির জন্যই নয়, অন্য কোন এক কারণে তাকে শের ঘৃণা করে। মল্লিকবাবু শাওনীবাঈ-র ঘরে আসে। তার গান শোনে। তার দেহ উপভোগ করে। হয়তো সেই কারণেই এই ঘৃণা। শের ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু মল্লিকবাবুকে শাওনীবাঈ-র ঘরে ঢুকতে দেখলে, শের দূর থেকে লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নেয়। মল্লিকবাবু সম্বন্ধে তার সুউচ্চ ধারণা কেমন যেন বিব্রত ভাবে তার মনের আনাচে কানাচে ঘুরপাক খেতে থাকে। হিমালয়ের মত বিশাল-হৃদয় মানুষটাকে অতি ক্ষুদ্র মনে হয়। অথচ এ কথা মল্লিকবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে সে ভাবতে পারে না। ছোট ছোট জলাশয়ে সূর্য আর চাঁদ ধরা পড়ে—কিন্তু বাস্তবিকই তা পড়ে না। যা ধরা পড়ে তা ছায়া। যে ছায়া সব সময় লক্ষ লক্ষ খাল বিল আর গোষ্পদকে মহিমান্বিত করে। শেরের ধারণা গোষ্পদতুল্য শাওনীবাঈর ঘরে এবং তার অতিক্ষুদ্র জীবনে মল্লিকবাবু কারুণ্যের ছায়াপাতই করে, নিজে ধরা দেয় না। স্পর্শ দেয় না। শাওনীবাঈ-র পরম সৌভাগ্য। তার সৌভাগ্য শেরের মনে ঈর্ষা জাগায় না, কিন্তু তবু সে শাওনীবাঈকে ঘৃণা করে।

শাওনীবাঈ মৃত্থ স্বরে চাপা সুরে তর্জন করে প্রতিবাদ করলে—

রূপয়ে নঁহী হ্যায়।

—রূপয়ে নঁহী তো সোনা দেও ?

শেরের অতিরিক্ত ঔদ্ধত্যের উত্তাপ শাওনীবাঈ-র ভীতির ভাবটাকে যেন মিথ্যে ভয়ের খোলশের মত জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দিল। শাওনীবাঈ জ্বলে উঠল—ক্যা কহা, বাত্তামীজ।

শের আর কোন উত্তর দিলে না। শুধু শাওনীবাঈ-র চড়া সুরে প্রশ্নের উত্তরে মুখের নীরব প্রান্তরে নিঃশব্দ হাসির ঝিলিক হেনে তার গলার চাঁপাহার ছিনিয়ে নিল, তারপর পর্দা ঠেলে বেরিয়ে গেল। মল্লিকবাবু কোনদিন কিছু বলে নি, অপর কেউ বলে নি; তবু শাওনীবাঈ-র কণ্ঠে মূল্যবান চাঁপাহার দেখে তার মনে হয়েছিল, এতটা উদার দাক্ষিণ্যের নির্দশন মল্লিকবাবু ভিন্ন আর কারো পক্ষেই এমন অযোগ্য স্থানে ছড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অনন্তগর্ভ সমুদ্র ছাড়া আর কেউ অগাধ জলের নিবিড় অরণ্যে হেলায় ফেলায় মুক্তো ছড়িয়ে রাখে না।

ভাবতে ভাবতে শের সিঁড়ির প্রায় শেষ ধাপে নেমে এসেছিল, আবার কি মনে করে ওপরে উঠল, তারপর শাওনীবাঈ-র ঘরে ঢুকে একবার চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বললে—হোঁসিয়ার, জরাভী হল্লা নঁহী হো!

শাওনীবাঈ তখন অপমানে আক্রোশে আর লুণ্ঠনের ক্ষোভে জর্জরিত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে। আর কয়েকটি পরাজিত পৌরুষ বিহ্বলদৃষ্টি তার দিকে তাকিয়ে আছে।

পূর্ণ নিশ্চয়তায় বাঁধা পড়ে লছমী হাঁফিয়ে উঠেছে। তার যান্ত্রিক জীবনের যান্ত্রিকতা আরো বেড়ে গেছে। বড় বেশি জীবিকার

স্থৈর্য। সহদেব তার সমস্তই শৃঙ্খলিত করে দিয়েছে। সব ভাবনা চিন্তা দুর্ভাবনা, ব্যবসায়িক অনিশ্চয়তা কোথায় যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

—তোমার আর ভাবনা কি লছমী! সহদেব বিকট দংষ্ট্রাপংক্তি মেলে হাসে। কিন্তু তাকে দেখে লছমীর আর অস্বস্তি বোধ হয় না। সহদেবের মুখের হাসি পরিচিত শ্বাপদের চেনামুখের হাসির মত মানানসই মনে হয়।

লছমী আজকাল নিয়মিত পান-জর্দা খেতে শিখেছে। সামান্য একটু জর্দা মুখে ফেলে বলল—কিছু কি ভাববার নেই, আমার বুঝি দিন শেষ হয়ে এসেছে? শুনেছি না-মরা পর্যন্ত মানুষের ভাবনা-চিন্তা শেষ হয় না।

সহদেব যেন সমবেদনায় ষাট-ষাট করে উঠল, মুখে এক ধরনের শব্দ করে বললে—আমি তা বলছি না, বলছি আইনের ফাঁস তোমার বাজার খুলে দিয়েছে। এভবড় বাজারের কে কোথায় সরে গেল, কোথায় গা ঢাকা দিলে, তার কোন পাত্তা নেই। আর যারা টিঁকে আছে, তারা তো দিনরাত থানা পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে; কিন্তু তোমায় তো পথে দাঁড়িয়ে শিকার ধরতে হয় না?

লছমী দুটি চোখ আয়ত করে অল্পদূরস্থিত বিগত দিনগুলির কথা স্মরণ করে। মনে হয়, সেই ভাল ছিল। ভাল ছিল আগেকার দিনগুলো। অন্ততঃ তখন একঘেয়েমির অত্যাচার ছিল না। নতুন আইনের বিপর্যয়ে হয় সে এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যেত, অথবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে শিকার সন্ধানের অবসরে আইনের কাঁচা রঙে রং-করা সুতোর ফাঁদে ধরা পড়তো।

বিষাদগ্রস্ত সুরে লছমী বললে—কিন্তু সহদেব, এ-ও যে আমার ভাল

লাগে না। কি হবে টাকা পয়সায়? কি লাভ শুধু শুধু বেঁচে থেকে? জীবনে কোন ভাবনা নেই বলে বসে খাব আর পচা জীবনটাকে আগলে বেড়াব, এ কি আর বেশিদিন ভাল লাগে? কি লাভ!

সহদেব কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকে, তারপর প্রায়-নির্বাপিত বিড়িতে একটা মোক্ষম টান দিয়ে, একমুখ ধোঁয়া উগলে দেয়। তার মুখের সামনেই ধোঁয়ার কুণ্ডলিটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘন মেঘের পর্দার মত ভেসে থাকে। চোখতুটি দেখা যায় না।

সহদেব শান্ত স্বরে বলে—ভাল কথা বললে লছমী, লাভ, অনেক লাভ! বেঁচে থাকাই তো তোমার পক্ষে মস্ত লাভ? হয়তো একদিন শেরের মন ফিরবে। হয়তো সে তোমায় নিয়ে ঘর বাঁধবে। তোমাদের ছেলেপিলে হবে। নতুন কোন শহরে গিয়ে শের কাজ করবে, সেখানে তোমার জন্যে বাসা ভাড়া নেবে। আর—

লছমী অবিশ্বাসের মৃত্থ হাসি হাসে—হবে তো সবই, কিন্তু যাকে নিয়ে এত কথা, সেই শের আর কোনদিন ফিরবে না।

সহদেব প্রতিবাদ করে—ফিরবে না কেন, সে তো বিশেষ কোন কারণ দেখিয়ে যায় নি, ঝগড়াঝাঁটিও করে নি?

লছমী হাসির শব্দটা উচ্চতর স্বরগ্রামে তুলে বললে—বৃথা তুই এই লাইনে আছিস সহদেব, এখনো মানুষ চিনতে শিখলি না! যে কারণ দেখিয়ে যায়, সেটা মেরামত হলে আবার ফিরে আসে। কিন্তু যে কোন কারণ রেখে যায় না, সে আর ফেরে না। তার ভেতরের কারণ এত বড় যে বাইরে কিছু দেখাবার দরকার হয় না, আর তা কোনদিন মেরামতও হয় না।…কিন্তু তোর স্বপ্নদেখা গল্প তো শেষ হল না?

—কি শেষ হল না—সহদেব ঝঙ্কৃত সুরে বলে—বলছিলুম বিদেশে কেউ তোমাদের চিনতে পারবে না। তোমরা—

কেউ চিনবে না, লছমী মুখ টিপে হাসল—আমি চিনবো না, শেরও আমায় চিনবে না?

সহদেব বিব্রত হয়, তার মুখে উপযুক্ত কোন উত্তর জোগায় না। ইতিমধ্যে লছমী আবার বলে—ভগবান চিনবে না, সারা জীবনের পাপ চিনবে না—সে কোন শহর সহদেব? কোন দেশের কথা বলছিস—টিলাকুঠির ঘাটের শ্মশান নয়তো!

সহদেব বিরক্তিতে গলা ঝেড়ে বলে—ষাট বছর বয়েসের গল্প ছাব্বিশ বছরের মুখে শুনতে ভাল লাগে না লছমী।

—আমার বয়েস বুঝি ছাব্বিশ! লছমী খিলখিল করে হেসে ওঠে—তবে তোর কত, তের? তুই তো আমার চেয়ে অন্তত পাঁচ দশ বছরের ছোট?

—আমি তোমার চেয়ে বয়েসে ছোট! সহদেব যেন ঝগড়া করার মত একটা বিষয় খুঁজে পায়, বিতর্কটাকে সে তাই সতেজ কণ্ঠের আয়ুধে বিঁধে রাখে।

—বয়েসে ছোট না হলে পুরুষ মানুষ কখনো বিনাস্বার্থে এতটা সেবা করে? আর সেই জন্যেই তো আজকাল আমায় 'তুমি' বলিস?—প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে এসে লছমী কতকটা সহজ বোধ করে।

সহদেব বলতে যায়—আমার স্বার্থ নেই। আমি—

জানি—লছমী তাকে বাধা দিয়ে বলে—তোর শুধু প্রেমের স্বার্থ, তার মানেই কিছু না। যারা রং করা বেলুন নিয়ে খেলে তারা তো বাচ্চা!

সহদেবের কাল্পনিক পৌরুষে ঘা পড়ে, সে সবিক্রমে বলে—জানো আমি ইচ্ছে করলে তোমায় কি করতে পারি?

লছমী ইচ্ছে করেই সহদেবের গা ঘেঁষে আসে। তার একটা হাতের পাতা টেনে নিয়ে মিথ্যে যৌনাবেদনের আঁচড় কেটে বলে—জানি, ইচ্ছে করলে কি করতে পারিস! দুনিয়ার লোকের যে ইচ্ছের চাপে কাঁচা টাকায় আমার তোরঙ্গ উপচে উঠছে, সেই ধরনের ইচ্ছে তো?, কিন্তু তা তোর হবে না। তুই যে শিশু! তোরা ভাবিস খেয়ে ফেললে বুঝি সব ফুরিয়ে যায়?

—তা তো যায়ই।

—দূর বোকা—লছমী সহদেবের গায়ে ঢলে পড়ে। মনে হয় সহদেবের সুপ্ত কামনা সঞ্জাত আপাত নিষ্কাম দানের প্রতিদান দিয়ে সে ঋণমুক্ত হতে চায়। লছমী বলে—খেলে বুঝি ফুরিয়ে যায়। খেলে খিদে বাড়ে, আর খিদে বাড়লে খাবার জিনিসও বেশি করে জোটে। জোটে—জুটেই চলে—। জানিস সহদেব, শের একটা রাক্ষস, খুব খেতে পারে! পাবে বলেই তার কোনদিন অভাব হয় না।

—তাই নাকি!

—হুঁ, আজকাল তাই আমায় ভুলে গেছে? গেছে তো বয়েই গেছে! দুনিয়ায় তো শুধু একটা শেরই নেই, সিংহও আছে। তুই সিংহ—

শেষ কথাগুলোর আবেশে লছমী চোখদুটি বন্ধ করে খানিকটা আত্মনিবেদনের অভিনয় করে। কিন্তু সহদেব আর এগিয়ে আসে না। সামান্য স্পর্শ আর নির্বিরোধ আমন্ত্রণেই সে আপ্লুত হয়।

সহদেব পরিপূর্ণ কণ্ঠে বলে—এর চেয়ে বেশি আমি চাই না, লছমী। আমার ভয় হয়।

—কিসের ভয়। লছমী বিস্ময়ের ধাক্কায় কিছুটা দূরে সরে যায়, তবু সে সহদেবের দেহের স্পর্শ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে না।—অসুখের ভয় বুঝি? লছমী জিজ্ঞাসা করে।

—শরীরের রোগ নিয়েই আমি জন্মেছি। আমায় কেটে শহরময় রক্ত ছিটিয়ে দিলে রোগ কিলবিলিয়ে উঠবে। রোগের ভয় আমার নেই।

কথা শেষ করে সহদেব গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। নিজের অজ্ঞাতেই তখন সে লছমীর কাছ থেকে সরে গেছে।

—তবে?—লছমী জানতে চায়।

সহদেব অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। দেয়ালের গায়ে কেরোসিন ডিবের কালির দাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলে—আমার দূর থেকে নোংরা ঘাঁটতে খুব ইচ্ছে হয়, কিন্তু কাছে গেলে ভয় করে। আমার তেত্রিশ বছর বয়েসে তোমার কাছে যতটুকু নিয়েছি, তার বেশি কারো কাছেই নিইনি। তুমি তো জান, আমার পক্ষে মে'মানুষ পাওয়া কত সহজ! শুধু নিচের তলা কেন, ওপর তলার গায়িকা সঙ্ঘের যাকে খুশি আমি কাছে ডাকতে পারি। ডাকতে পারি অথচ ডাকি না, এই লজ্জাতেই সেই বিছে-কামড়ানো খদ্দেরকে হাসপাতালে পৌঁছে সেদিন রাত্তিরে তোমার কাছে ফিরি নি।

—কিসের লজ্জা সহদেব? সহদেবের কথাগুলো লছমীর কানে অদ্ভুত বেদের বাণীর মত শোনায়।

—মোতিবিবির নাম শুনেছ লছমী?

—না তো! সহদেবের প্রশ্নের উত্তরে লছমী একটা দায়সারা রকমের জবাব দিয়ে পরবর্তী কথা শোনার আগ্রহে উৎকীর্ণ হয়ে রইল।

—তোমার শোনবার কথাও নয়, এ তো মনসুরগঞ্জের একঘেয়ে ঘটনা। তা-ও আবার বিশ-বাইশ বছরের পুরনো কথা। মোতিবিবি আমার মা ছিল বলে শুনেছি। যেন বর্শার এক ঘায়ে মোতিবিবি আর লোকটাকে মেরে ফেলেছিল। আমায় লাশ দেখতে দেয়নি, সবই কানে শোনা। তারপর বড় হয়ে এ নিয়ে যত ভেবেছি, ততই ভয় বেড়েছে। সেই সঙ্গে নারী পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা বিকারও জেগেছে। এখনও মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি, তবু ইচ্ছে হয়—।

—কি ইচ্ছে হয়? সহদেবের আচম্বিত পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেওয়া কথাটা শোনবার জন্যে লছমীর কৌতূহলের ইন্দ্রিয়গুলি উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু সহদেব আর মুখ খুলতে চায় না। লছমী অনুরোধ করে, আব্দার উপরোধ করে, রাগ করে, ভবিষ্যতে আর কথা বলবে না বলে ভয় দেখায়; কিন্তু সহদেব আর মুখ খোলে না।

লছমী শেষ পর্যন্ত বলে—বেশ মানুষ তুই! মেয়েছেলেকে অর্ধেক কথা শুনিয়ে রাখলে কি হয় জানিস?

—কি হয়

—নরকে যেতে হয়।

—নরকে যার জন্ম তাকে নরকের ভয় দেখাচ্ছিস!—সহদেব ব্যঙ্গের হাসি হাসে, তারপর অর্ধমুদিত চোখে কৌতুকের চিহ্ন ফুটিয়ে বলে —তবে এখন বুঝি স্বর্গে আছি?

কিন্তু সহদেবের অসম্পূর্ণ কথাটুকু শোনার আগ্রহে লছমী প্রায় কেঁদে ফেলে—তা জানি না কোথায় আছিস, কিন্তু বলতে বলতে থামলি কেন?

সহদেব কখন 'তুই' বলে ফেলেছিল, আবার তুমি দিয়ে আরম্ভ করল—শুনলে তুমি ভয় পাবে লছমী। লছমীকে সাবধান করে দিয়ে সে অসম্পূর্ণ কথা শেষ করার আয়োজন করে। গুছিয়ে বসে বলতে থাকে—যখন তোমার ঘরে লোক এনে ঢোকাই তখন মনে মনে ভগবানকে ডেকে কি বলি, জান ? বলি, হে ভগবান, মোতিবিবি আর সেই লোকটার মত লছমী আর এ লোকটাকে কেউ যেন এক বর্শায় বিঁধে শেষ করে যায়। তারপর আমি ঘরে ঢুকে সেই মরণের দৃশ্য দেখে কাঁদি। খুব কাঁদি। যদি কোনদিন কেউ তোমায় আর শেরকে এক কোপে খুন করে যায়, সেদিন আরো কাঁদব। আরো খুশি হব। যদি কখনো শেরের সঙ্গে তোমায় এক ঘরে এক সঙ্গে পাই হয়তো সেদিন ভগবানকে না ডেকে নিজের হাতেই তোমাদের খুন করব। তারপর হাতের রক্ত মুছে কাঁদতে বসে যাব। মারা যাবার পর মোতিবিবিকে আমি দেখতে পাই নি, বেশ্যার ছেলে বলে চেঁচিয়ে কাঁদতে পারি নি। তারপর বিশ বাইশ বছর কেটে গেছে, তবু দেখার আগ্রহ আমার ঘোচে নি। বুকের ভেতরের জমা কান্নাটা শুকিয়ে যায় নি।

কামিজের ওপর থেকে বুকের অশ্রুসঞ্চিত গুপ্ত কক্ষের দরজায় হাত রেখে সহদেব অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। লছমী তাকে বার কয়েক ডাক দেয়, কিন্তু সাড়া পায় না।

আজ সকাল থেকে এক অদ্ভুত ভাললাগার নেশা শেরকে পেয়ে বসেছে। ঘুমভাঙ্গার পর থেকে মনে হচ্ছে, আজকের আকাশ সুন্দর। বাতাস সুন্দর। মনসুরগঞ্জ পল্লীর পথঘাট দোকানপত্র, গায়ক গায়িকা সঙ্ঘের সভ্যা-নামাবলী-জড়ানো বারবিলাসিনীর দল,

ভাঙা কুটিরের আঁস্তাকুড়ে গা-ঢাকা-দেওয়া অল্পমূল্যের পতিতারা, গিরগিটের মত নারীরক্তপায়ী দালাল শ্রেণী—যেখানে যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, সব সরল, সব সুন্দর। আর এই পৃথিবী!

শের মনে মনে দীনদুনিয়ার মালিকের কেরামতির তারিফ করে। মুহুর্মুহু তাকে সেলাম জানায়—হে খুদা, হে আল্লা, হে বীরের বীর মহাবীরজী, আমি আর কিছু চাই না, শুধু একটা উনিশ শ' চৌত্রিশ জল্‌জলা এনে দাও। ভূমিকম্প দাও। যে যেখানে আছে, সব মরে যাক। বেঁচে থেকে কেউ আমরা জিন্দগীর পয়গম গাইতে পারতাম না, মরার পর প্রাণ খুলে তোমার মহিমা কীর্তন করব।

শের বাঁচতে চায় না। এ দুনিয়ায় কারো জীবনের পঙ্কিলতা আর দেখতে চায় না। লছমীর কথা সর্বাগ্রে যেন মনে পড়ে। একান্ত অকারণে তার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওটাও মরে যাক। সবার আগে মরুক লছমী। সব জিন্দগীর কুরবানী হোক, শুধু মুহব্বৎ বাঁচুক। প্রেমের আয়ু অক্ষয় হোক।···

মল্লিকবাবুর টাকায় গন্নু দোকান খুলেছে। শের উদ্‌ঘাটনী দেখতে আসে নি। আজ কি মনে করে সে দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। তখন সবেমাত্র গন্নু এসে দোকানদারী আরম্ভ করেছে। শেরকে দেখে সাগ্রহে অভিবাদন জানালে—সেলাম মামা—

—আদাব ভাই আদাব, আদাব মেরে বাপকা শালা—!

—তুই তো একদিনও আমার দোকান দেখতে এলি না?—

অভিমানের সুরটা গন্নু পাকারেখায় মুখের চামড়ায় ফুটিয়ে রেখে কি একটা খুঁজতে থাকে। এক টিন দামী সিগারেট। বিলায়তী!

—বাঃ, শের যেন কৌটোটা গন্নুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। তারপর ঢাকনি খুলে বললে—আরে এ তো কাটাই হয় নি!

—কাটব কার জন্যে ? এ তো তোরই—

—সত্যি গন্নু, তুই সত্যিই আমার পেয়ারের বাপ কা শালা। আমার বড়ি আম্মার বা'জানের ছোটি বিবির মাঝলা লাড়কা। আল্লা আমায় আলমগীর বানাতে গিয়ে ভুল করে ডাকাইত বানিয়ে দিয়েছে।..হাঁ—শেরের বোধ হয় কথাটা তখুনি মনে পড়ল—আমার কমিশনের হানরেড রূপিস দে, যেটা তোর কাছে জমা রেখেছি ?

—সে তো আলাদা করে রাখাই আছে !

গন্নু নতুন কেনা ক্যাশ বাক্সের ডালা তুলে একটা একশ' টাকার নোট শেরের হাতে তুলে দেয়। নোটখানা কোমরে গুঁজল শের, তারপর কোমরের অপর দিক থেকে একছড়া সোনার হার বের করে গন্নুর দিকে ছুঁড়ে দেয়।

—কি এটা, সোনা ?

—হুঁ—শের গম্ভীর মুখে বলে—তোর কাছে জমা রাখ, পাথর বসানো আছে, ভাল খদ্দের পেলে চেয়ে নেব।

—চুরির নয়তো ?

—চুরি ! শের ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করলে। তারপর এক অতিরিক্ত ঘৃণা বোধ হল তার, সেই মনোভাবের অভিব্যক্তিতে হাতের আধপোড়া সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—আমি কোনদিন চুরি করেছি ? এটা শাওনীবাঈ-র গলা থেকে ছিঁড়ে নিয়েছি।

—কখন ?

—শের ঠোঁট উল্টে বললে—কবে কখন, তা কি আমার মনে আছে। পূর্ণিমা ছিল কি অমাবস্যা ছিল, দুপুর ছিল কি রাত

ছিল, তার কৈফিয়ৎ তোকে দিতে পারব না।

—শাওনীবাঈ পুলিসে খবর দেয় নি ?

—পুলিস! শের এবার গন্নুর দোকানের সামনে কেরোসিন কাঠের বাক্সটার ওপর চেপে বসল। সদ্য সমাগত একটি খদ্দের বিদায়ে গন্নুর যতটুকু সময় খরচ হল ততটুকু সময়ে সে পরিপূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে আর একটি সিগারেট ধরিয়ে নিল। নীরবেই সেটা টেনে চলল সে।

গন্নু আবার প্রশ্ন করল—পুলিসে খবর দেয় নি ?

—পুলিস! শের অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল। হাসতে হাসতেই বললে—পুলিস যেমন ওদের বাপ হয়, কেউ বা ভাতার হয়, তেমনি আমারও বড় কুটুম হয়। তারপর কতকটা গম্ভীর হয়ে কিঞ্চিৎ বিনম্র স্বরে বললে—কেউ আবার ভাই হয়!

শেরের কথার শেষ অংশে গন্নু তেমন মনোযোগ দেয় নি। শালার মত ভাই শব্দটাও সে সমানার্থক মনে করেছে।

কিন্তু এর পরই শের হঠাৎ সেখান থেকে উঠে গেল। দিগ্‌ভ্রম হল তার। আজকাল অবশ্য সে স্বেচ্ছায় দিগভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তার দৈনন্দিন নিয়মগুলো তো জলাঞ্জলি দিয়েছে। ইচ্ছে করেই লছমীকে ছেড়ে দিয়েছে। বাহাদুরেরও খবর নেয় না। নেউলটা আর কাঁকড়াবিছেগুলো আছে কি না, তার সঠিক সংবাদ তার জানা নেই। কোন কিছুতেই আগ্রহ নেই তার। অনুলিপ্তি-বোধ নেই। পতিতাবৃত্তি নিরোধক আইন বলবৎ হতেই সে যেন এ পৃথিবীর সঙ্গে অসহযোগিতা আরম্ভ করে দিয়েছে। অথচ এ জীবনের সঙ্গে তার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না। বরং সে এদের এবং এ সমাজের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকটিকে ঘৃণা করেছে। সর্বান্তঃ-

করণে এই নিষ্করুণ ঘৃণিত ব্যবসায়ের উচ্ছেদ কামনা করেছে। পতিতাকুলের নিধন কামনা করেছে। এবং লছমীর মৃত্যু চেয়েছে।

নির্দ্বিধায় শের একশ' টাকার নোটখানা ভাঙিয়ে ফেলল। তারপর প্রায় নব্বই টাকায় এক বোতল বিলায়তী সরাব কিনে নিল এবং বাকি টাকা ক'টা লুঙ্গির ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে একটি রিক্সায় চেপে বসল।

—কঁহা যাইয়েগা, হুজুর ?

—যঁহা তক্ খুলা আশমান হ্যায়। যব তক্ তুমহারা গোড় নঁহী টুট পড়ে, তব তক্ হাঁকাও। ঝম্‌ঝমাঝম্ হাঁকাও। সমঝা উল্লুকা শালা ?

অতএব রিক্সা ছুটল। শেরের মনের ত্ব'পাশ দিয়ে উন্মুক্ত পথ ছুটে যাচ্ছে। মাথার ওপর ছুটছে উন্মুক্ত আকাশ। শের মুদিত চোখে সেই মুক্তির অনুভূতিটুকু নিজের অখণ্ড অবসরের গায়ে এঁকে চলেছে।

—রোক বে শালা, রোক য়ঁহা পর !

এক খোলা ময়দানের পাশে রিক্সা থামিয়ে শের নেমে পড়ল, বললে —লে পাঁচ রূপয়া বকশিশ।

যথার্থ ভাড়ার ওপর প্রায় টাকা তিনেক বকশিশ ; রিক্সা চালক প্রশ্ন করল—হুজুর ফির শহর লৌটিয়েগা ন ?

—তেরে বাপ কা ক্যা রে ?

অতএব ঘর্মাক্ত কলেবর মানুষটি পুনরায় ধীরে ধীরে শহর মুখে রিক্সা পরিচালিত করল। শের ময়দানে ঢুকল। তারপর উগ্রমূর্তি সূর্যের চাঁদোয়ার নিচে ঘাসের গালিচায় দেহ প্রসারিত করে দিল। অল্পক্ষণ

একভাবে পড়ে থেকে আবার উঠে বসে বিলায়তী সরাবের বোতলটির দিকে মনোনিবেশ করল। পানীয়ের স্বাদ আস্বাদনের সঙ্গে এই ছুনিয়ার মালিককে সুক্রিয়া দিল। সহস্র ধন্যবাদ দিল। কৃতজ্ঞ-চিত্তে বললে—হা আল্লা, এ ছুনিয়ায় আমার পয়দায়ীস ঝুটা হয় নি। মিথ্যে জন্ম আমার হয় নি। আমি ভাইজানের বুকে কিরিচ বসিয়ে প্রথম হাতের কাজ শিখেছি, তারপর কত খুন করেছি—তিশ চালিশ কি আরো বেশি! বান্দা যা করেছে নিজের জান কবুল করেই করেছে। কারো মেহরবানী চায় নি। কোন ভিক্ষে নিইনি আমি। চুরি করিনি, চুরি করে বাঁচতেও চাইনি। শোভান আল্লাহ! তবু বেঁচে আছি, তবু সারা জিন্দগী সবসে উন্দা সবসে বঢ়িয়া খানা খেয়েছি। বিলায়তী সরাবে গলা ডুবিয়ে সাঁতার কেটেছি। সবই তোমার হুকুম। তোমার মরজী। বান্দা এবার তোমার কাছে পৌছুবে। তোমার খাশ দরবারে খিদমৎ খাটতে যাবে। সারা জিন্দগী তোমার দোয়ায় বাদশাহী করে গেলুম, এবার হুকুম তালিম করব।

পানীয়ের শেষ বিন্দুটাও শের খুদাতাল্লার হুকুম নিয়ে মুখে ঢালল। এ বিলায়তী সরাব। খুদামিঞার ইটালিয়ান বাগিচার ফাস্‌কিলাস দ্রাক্ষাসার। স্বাদ গন্ধ তো মামুলি বাৎ, আভ্যন্তরিক ঐশ্বর্যই বা কত! এ বস্তু পেটে না পড়লে ভাল ভাল কথা চিন্তা করা যায় না। বিলায়তী সরাবের স্পর্শ সব ভুলিয়ে দেয়। লছমীকে ভুলিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে এই তুচ্ছ পৃথিবীটাকেও ভুলিয়ে দেয়। নর্দমার শুকনো পাঁকে গড়া এই ছুনিয়া আর তারই উপযুক্ত জীবগোটিকে ভুলিয়ে দেয়। এদের ভুলতে না পারলে তো ঐ সত্তাটাকে মনে পড়ে না! তার সঙ্গে মিলিত হবার বাসনায় দিল্ আনচান করে না—

সত্যিই শেরের বুকের মধ্যে আনচান করে। আর দেরি সহ্য হয় না। টিশনে ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে। আর সময় নেই, সব কিছু অতি ত্বরিত হাতে সেরে নিতে হবে। যা হবার তা হল। যা হল না তার জন্য আর অপেক্ষা করা চলে না।

ওটুকু ছাড়তে হবে।

ইচ্ছে ছিল লছমীকে সাদি করে। কমলা পড়িয়ে, কাজি মোল্লা ডেকে আংরেজী বাজা বাজিয়ে, কাগজে কলমে দেন মোহর লিখে, ফিটিন গাড়ি হাঁকিয়ে, তাকে আঠারো আনা বোরকা-পরা বিবি করে নেয়। ইচ্ছে ছিল। আগ্রহ ছিল। প্রবৃত্তিও অনুদার ছিল-না।

—আর দেরি সয় না রে লছমী, এবার তোকে ফাইনাল বিবি করে নেব।—শের গাম্ভীর্যপূর্ণ আগ্রহের সঙ্গে লছমীকে বলেছে। নিষ্ঠাপূর্ণ আশ্বাস দিয়েছে।

লছমীরও অনাগ্রহ ছিল না, শুধু নিজের দেহের বৃত্তিসুলভ রোগটার কথা স্মরণ করে সামান্য একটু সময় চেয়েছিল সে, বলেছিল—আর কিছুদিন সবুর কর? ডাক্তার বলেছে, এ বিমারী আজকাল সেরে যায়।

—সে সাদির পরও সারতে পারে; তাছাড়া আমাদের ভয় কিসের, তোর তো আর বালবাচ্চা হবে না?

—হবে না কেন! কথাটা লছমীর মনঃপূত হয় নি।

শের হেসে বলেছে—হবার থাকলে এতদিনে তোর দু'চার দর্জন বচ্চো মিলে এ-কিলাশ 'ফুটবল টিম' গড়ে দিত। তা আজও যখন হয় নি, আর কোনদিনই হবে না।

—হয়নি, আমি চাইনি বলেই হয়নি।—লছমী কথায় জোর দিয়ে বলে—এতদিন চাইনি, তা'বলে কি সারাজীবনই চাইব না?

শের এতক্ষণ প্রায় সংযত ভাষাতেই কথা বলছিল, এবার অশ্লীল হাস্য সহকারে বললে—হাত পাতলে ভিখ মেলে, চোখ বুজলে মৌৎ মেলে, কিন্তু পেট পাতলেই বাচ্চা মেলে না। এসব আল্লার মেহরবানীতে হয়, কিম্বা তার গোসায় হয়। তোর ওপর আল্লার মেহরবানী বা গোসা কোনটাই নেই। তুই ফালতু!

—নাঃ নেই! কেন নেই শুনি? আমি কি মানুষ নই?

—আমি আল্লা মিঞার ফুটবাল টিমের কাপ্তান, তোর পায়দা কবা পিলিয়ার আমার পছন্দ নয়।

সাদির কথাটা দূরে সরে যাচ্ছিল, লছমী সেই প্রসঙ্গই আবার টেনে আনে—হাঁরে শের, তোদের কি সব মাসেই সাদি হয়?

—সে জানে কোন মিঞা! আরে, জোয়ান আদমীর সাদি আমাশী-য়ার রাতে হতে পারে, আবার পূর্ণিমাসীতেও হতে পারে। ভর জাড়াতে হতে পারে, আবার কাঠ-ফাঠা ধূপেও হতে পারে। সাদি-ফাদি তো কাগ্‌জি বাৎ—আসল হচ্ছে মুহব্বৎ। ইস্ক!

—তবে দেরি কেন, জাত দিতে হলে তো আমাকেই দিতে হবে, তুই তো আর হিন্দু হবি না?

—হুঁ, হিন্দু কে হতে চায়!—শের পরম তাচ্ছল্যের সঙ্গে বললে—যদি চানাস্ পাই তো আংরেজ হয়ে যাব। মনমে গোরা, তনমে ভী গোরা।

—দূর বোকা, লছমী মুখ নাড়া দিয়ে বলে—তোর এত আংরেজ হবার শখ কেন?

—ছাড় এ-সব পালেটিকাল বাৎ, তুই বুঝবিনা। আমার যা মনে হল তাই বললাম, আংরেজ আচ্ছা খানা খায়। আংরেজী সরাব—

শেষ পর্যন্ত একটা আধপাকা ধরনের সাদির দিনও স্থির হয়ে গিয়েছিল। সাদির পর তারা এ শহর ছেড়ে চলে যাবে। যাবে অন্য কোন বড় শহরে। আরো দূর পশ্চিমে। সেখানে শের কোন বড় আখড়ায় নাম লিখিয়ে কুস্তি আর দঙ্গলের পেশাদার পালোয়ান হয়ে যাবে। শরিফ জিন্দগী বিতিয়ে দেবে বাকি বছরগুলো। লছমী তার ঘর আগলাবে। হবে—হবে—। বালবাচ্চা একটা-আধটা হবে বইকি! নয়তো কে ডাকবে আম্মা বলে, শেরই বা অবসর সময়ে কার সঙ্গে খেলা করবে?

লছমীর দেহমনে নতুন জীবনের নতুন পালিশ পড়বে। শের একদম গম্ভীর হয়ে যাবে। খারাব বাৎ একটাও বলবে না, বাল-বাচ্চার সামনে লছমীকে ডাঁটবে না। আদরও করবে না। প্রহরে প্রহরে নামাজ পড়ে ললাটের মাঝখানে গর্ত রচনা করবে। লছমী হিন্দুর ধর্ম পালন করুক বা মুসলমানই হয়ে যাক, শের তাকে নিয়মিত মহাবীরজীর পূজো দিতে পাঠাবে। সেদিন খুব পবিত্র ভাবে থাকবে দুজনে। বড় জাগ্রহ দেবতা মহাবীরজী। অসীম শক্তিশালী। কাঁধের ওপর ‘হিমালিয়া মাউনটেন’ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পূজোর প্রসাদ নিয়ে শের জেলায় জেলায় কুস্তি লড়তে যাবে। সেখান থেকে প্রতি হপ্তায় খৎ পাঠাবে। রূপায়া তো পাঠাবেই, নয়তো বালবাচ্চা নিয়ে লছমী কি ভিখ মাঙ্‌বে!

স্বপ্ন দেখা হল। মনোরম পরিকল্পনা রচনা হল, কিন্তু বাস্তব রূপান্তর হল না। কোথা থেকে নরকের কীট সহদেবটা লছমীর সঙ্গে জুটে গেল, আর সেই সঙ্গে শতাব্দীর আইন বদলে গেল। মৃতপ্রায় লছমী বেঁচে উঠল। দিন ফিরল তার। অবশ্য সহদেব বলে, লছমীর দিন শেষ হল। ফুরিয়ে গেল।

সহদেবের কথাই শের বিশ্বাস করে। যার কিছু নেই, যার সব গেছে, তার জীবনোল্লাস মৃত্যুরই নামান্তর। এ যেন ভাল করে মরবার জন্য একবার পূর্ণরূপে বেঁচে ওঠা। সেই বাঁচাই লছমী আজ বেঁচে আছে। তাকে সাদি করার পরিকল্পনা নিয়ে শের আর মাথা ঘামাতে রাজী নয়।

লছমী আর লছমী নেই, সে এখন একটা হাড় আর চামড়ার যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। তাকে নিংড়ে, তাকে পরিচালিত করে, রূপায়া পায়দা করা চলতে পারে; কিন্তু জিন্দগীর রস আর বেরুবে না। লছমী শেরের পেটের খিদে মেটাতে পারে কিন্তু ভুখা দিলকে পরিতৃপ্ত করতে পারবে না। মুহব্বৎ মরে না, কিন্তু মরা মানুষও কোনদিন বেঁচে ওঠে না। তার মুহব্বৎ হয়তো আজও বেঁচে আছে, কিন্তু লছমী মরে গেছে!

এই তো তেপান্তরের মাঠ থেকে শহরের কোতোয়ালি থানা পাকা রাস্তায় টানা পাঁচ মাইল। রাস্তায় মাঝে মাঝে এক আধটি বিলায়তী সিগারেট ধরানো ছাড়া সুদীর্ঘ পথশ্রমের কথা শেরের মনে পড়ল না। শুধু মনে ছিল, আজ সূর্যোদয়ের সময় থেকেই মনে হয়েছিল, রসুল খাঁর সঙ্গে একবার দেখা করা প্রয়োজন।

রসুল চিনতে পারল না। বরং শেরের ভূমিকা বর্জিত বাক্যালাপে সমস্ত বিষয়টা তার দুর্বোধ্য মনে হচ্ছিল। লোকটিকে সম্পূর্ণ মর্যাদা দিতেও বাধছিল তার।

রসুল শেরকে সোজাসুজি তুমি বলেই সম্বোধন করলে—কি চাও? কাকে চাও?

—তোমায়।

—কেন ?

—দরকার বিশেষ নেই, শুধু মুলাকাৎ—

—কেন !

শের হাসল। বিনা অনুমতিতে সামনের চেয়ারে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে বসে পড়ে একটা হাই তুলে তুড়ি বাজিয়ে বললে—পুলিসের দারোগার শুধু কেন আর কি কাম! অথচ যদি সত্যি সত্যি কাম করতো— !

রসুল অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করছিল, আপাত-গাম্ভীর্যের মুখোশে সে বিরক্তি ঢেকে রেখে বললে—যদি কোন কাজ থাকে তো বল, দেখে তো মনে হয় গুণ্ডা ? কি কেস ? একশ' নয়, দশ—ব্যাড্ লাইভলিহুড্ ?

আইনের চাকায় বিশ পঁচিশ বছর ঘুরে শেরের কয়েকটি ধারা আর তৎসম্বন্ধীয় গুটিকয়েক ইংরেজী শব্দ বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। রসুলের কথায় শের হাসল। ইংরেজী সিগারেটের টিন খুলে একটি সিগারেট বের করে ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরল। তারপর টিনটা রসুলের দিকে বাড়িয়ে দিল।

রসুল উপহার গ্রহণ করল না, কিন্তু আড়চোখে সিগারেটের টিনের গায়ে মূল্যবান ছাপ লক্ষ্য করে বললে—দিন তোমার বেশ ভালই কাটছে, কি বল ?

—আল্লার মেহেরবানী! প্রত্যাখ্যাত সিগারেটের টিন বন্ধ করে রসুলের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে শের নিজের মুখের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করল, তারপর একমুখ ধোঁয়া অত্যন্ত অবহেলা ভরে আকাশের দিকে উড়িয়ে দিয়ে বললে—আজ খুদা আমার তকদীরে সবচেয়ে উন্দা চিজ মিলিয়ে দিয়েছে; বিলায়তী সিগ্রেট, বিলায়তী সরাব, আর—

শেরের অসমাপ্ত কথার মাঝেই রসুল দারোগা বাধা দিল। তার পক্ষে আর আত্মসংবরণ করা সম্ভব হল না, বললে—কি চাই তোমার, ক্যা মাংতে হো তুম ?

অতিরিক্ত জোরের সঙ্গে উচ্চারিত 'তুম' শব্দটা শেরের কানে যেন হাতুড়ির ঘা মারল। শের আয়াস ছেড়ে সোজা হয়ে বসল।

--শের-ঈ-যোগসরকা নাম শুনা হ্যায় আপ ?—কথাগুলো শের পরিষ্কার উর্দুতে বলে গেল—হুজুর এ শহরে নতুন এসেছেন; আমি একশ' নয় দশের মোকর্দমার পৈরবী করতে আপনার কাছে আসিনি। আমি খুনের আসামী। রসুলসাহেব, যদি আপনার ইচ্ছে হয় তাহলে অন্যান্য খুনের ওপর একটা প্রায়-গুরু ধারা আপনিও চাপিয়ে দিতে পারেন, কারণ, আমি একদিন আপনাকে খুন করবার চেষ্টা করেছিলাম। বড় ভাইকে আপনার মনে আছে কি, মুহম্মদ ঈসরাইল খাঁ-কে ?

সে আঘাতের পর মরেই গিয়েছিল রসুল। বেঁচে উঠে শুনেছে তার বাঁচার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। মানুষের চেষ্টায় সে বাঁচে নি, বেঁচেছে পরমায়ুর জোরে। বড় ভাইকে, সেই দুর্দান্ত-স্নেহশীল নিষ্ঠুর-অত্যাচারী ভাইজানকে, তার মনেও ছিল না। তার কথা কোনদিন বাড়িতে আলোচিত হয় নি। আব্বাজানের অভিশাপের তলায় সব চাপা পড়ে গিয়েছিল।

অভিজ্ঞ রসুল খাঁ এক মূর্খ-অবোধ দৃষ্টি নিয়ে শেরের দিকে তাকাল। শের তা লক্ষ্য করল না। কখন আবার সে রসুলকে আপনি থেকে তুমির আয়ত্তে টেনে এনেছে। একটা নতুন সিগারেটও ইতিমধ্যে দুটি ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরেছে।

শের ধীরে ধীরে পারিবারিক সংবাদ সংগ্রহ করে। আব্বাজান

আম্মাজান এবং আর সকলকার কথা জিজ্ঞেস করে। বাড়ির উঠানে সজিনা গাছটায় তেমনি অসাধারণ ভোমাপিল্লুর উৎপাৎ সম্বন্ধেও খবর নেয়। বুড়ি ঝি নসীমের দাদী এখনো বেঁচে আছে কি? রসুল যন্ত্রচালিতের মত উত্তর দিয়ে যায়। ছকে-বাঁধা কলে-ফেলা কণ্ঠস্বর এবং পরিমিত বাক্যে সব প্রশ্নের উত্তর দেয় সে।

অবশেষে শের বলে—আমার নামে চারাজ-সীট করে দে রসুল। অনেক খুন করেছি, ডাকাতি করেছি। তু' একটায় চালানও হয়েছি, কেস চলেছে কিন্তু খালাস পেয়ে গেছি। আমি তোকে সব 'কুলু' বলে দেব, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কনফেসন করব—আমার নামে তুই চারাজ সীট করে দে?

শেষের কথাগুলোয় শের যেন অনুনয়ে ভেঙে পড়ে—আর কিছু চাই না আমি, আমার কোন আফসোস নেই। খুদা আমায় অনেক দিয়েছে। যা চেয়েছি, যা দাবি করেছি, সব—। যারা খুনী, যারা কাতিল, তাদের মনে যে আফসোস হয়, তা আমার নেই। তবু আর আমার বাঁচতে ইচ্ছে করে না।

শের কোমর থেকে ছোরাখানা টেনে বের করে—এই ছুরা যেমন তোর কলিজায় অনায়াসে বসিয়ে দিতে পারি, তেমনি নিজের ছাতিতেও পারি। কিন্তু আর শখ নেই—সরকারের কানুনকে অনেক ফাঁকি দিয়েছি, এইবার তার সব পাওনা আমি উসুল করে দিতে চাই।

রসুলের বিশেষ কোন ভাবান্তর ঘটে না, সময়ের ব্যবধান তার মনে এক অদ্ভুত নিস্পৃহতা এনে দিয়েছে; তবু সে বিগত সম্পর্ক স্মরণ করে বলে—আমার দ্বারা কিছু হবে না। তুমি যাও।

রসুলের উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে শেরের দুটি চোখে যেন আগুন জ্বলে

ওঠে, সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, তারপর তিক্ত কণ্ঠে বলে—রসুল, তুই বেইমান, নিমকহারাম! এতদিনে বুঝলুম কেন তোকে খুন করার ইচ্ছে হয়েছিল। তোর আব্বা এখানে থাকলে আজ আমায় মাফ করত না। তুই আমাদের খান-দানের গন্দগী। অবর্জনা!

রসুল তবু বলে—তুমি এখান থেকে চলে যাও ভাইজান—

—না রসুল না! এবার শের সত্যিই ভেঙে পড়ে। তার দুটি চোখ অনর্গল অশ্রুতে আপ্লুত হয়।—আমার নামে চাবাজ সীট করে দে রসুল। আল্লার কাছে তোর জন্যে দোয়া চাইব। আমি ইনশান। আমি নিজেকে ভালবাসি। তোকে ভালবাসি। দুনিয়াকে ভালবাসি। জিন্দগীকে ভালবাসি। জিন্দগীর সঙ্গে বেইমানি করতে পারব না। আমি 'সারানডার' করছি।

তারপর শের অল্পক্ষণের জন্য নীরব হয়। কিছু ভেবে নিয়ে বলে—হাঁ, মনসুরগঞ্জের গন্নু পসারীকে বলিস, শাওনীবাঈ-র চাঁপা হারটা তাকে যেন ফিরিয়ে দেয়।

লছমীর কথাও শেরের মনে পড়ে। কিন্তু না, আর দেখা না হওয়াই ভাল। তার জন্য কোন সংবাদ রেখে যেতে চায় না শের। ব্যবধানটাকে সংক্ষিপ্ত করবার চেষ্টা করবে না সে। সব মিলনের মূল মন্ত্রই যে চিরন্তন ব্যবধান! আশমান আর জমিন এক হয় না কখনো, বিচ্ছিন্নও হয় না কোনদিন। দূর-গগনের সিতারার মত লছমী দূরে থাক। শেরের মুহব্বতের মাটিতে তার প্রেমের স্তিমিত রশ্মি এসে পড়ুক। দূরের আলো। স্তিমিত আলো। কিন্তু অনির্বাণ।